বঙ্গদর্শন

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

ফাল্গুন ১৩৫৬ • দ্বিতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় খণ্ড • প্রথম সংখ্যা • মূল্য দশ আনা

বঙ্গদর্শন

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

ঃ ঃ শ্রাবণ ১৩৫৬

বিষয়-সূচী

১। রাজভক্তি — বঙ্কিমচন্দ্র
২। মধুমালিকা (কবিতা) — শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী
৩। "বঙ্গদর্শন" (প্রবন্ধ) — শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
৪। বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি — বঙ্কিমচন্দ্র উপাধ্যায়
৫। আকস্মিক (গল্প) — শ্রীনলিনীকুমার বসু
৬। স্মৃতি-স্মৃতি —
১। বাঙালীর জাতি-পরিচয় — পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। বাসনা-বিহগ (কবিতা) — শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

ইণ্ডিয়া অ্যালকালিজ লিমিটেড

:: ফ্যাক্টরী :: ৮/১, বাগমারী রোড, কলিকাতা-১১

:: মার্কেটিং এজেন্টস্ :: ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ
GRAM : NEWWORKS :: PHONE : CAL. 1351

:: হেড অফিস :: ২, পার্কষ্ট্রীট স্কোয়ার, কলিকাতা-১

ক্যাস্থুরিন : ঘনীভূত তরলীয় সার, বাগানের কার্যে ব্যবহার্য।

ডাইগন : (ডি. ডি. টি. সহ) পতঙ্গনাশক

পাইনোসল : ঘনীভূত পাইন তৈল। বীজানুনাশক ও প্রতিষেধক।

সলডিন : : ক্ষমতা কিনষ্টল বীজানুনাশক : বহন করা সহজ

লাইসজেল : : ঘনীভূত লাইসল ব্যবহারে স্বল্পব্যয় : বহন করা সহজ।

স্যানিসল : : বীজানুনাশক তরল সাবান। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য।

ফসফেটস : ডাই এবং ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট। মনো, ডাই এবং ট্রাই সোডিয়াম ফসফেটস। পটাসিয়াম ফসফেটস

লিকসো : বীজানুনাশক তরল সাবান

ক্লিনিট : কাপড় কাচা সাবান

মূল রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ উৎপাদনের পরিকল্পনা ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন এবং উপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানীরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

বঙ্গদর্শন ঃ ঃ শ্রাবণ ১৩৫৬

	শেষ পাঠ (গল্প)		
২।	মণি-মঞ্জুষা —		
	ভূতপূর্ব কিছু ছাড়ে		৩১
	১। তুমি কে ? তুমিই কিশোর		৩১
	তোমার বাঁধে বেণুটি মাথে ...		৩৩
	২। ওগো তুমি ওগো নবীন		৩৪
	৩। এক রাত্রি		৩৫
	৪। নবীন বন্ধু, তোমার কাছে		৩৬
	রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প (প্রবন্ধ)	শ্রীকাঞ্চিলাল রায়	৩৭
	গ্রন্থ-পরিক্রমা —		
	১। মরুতরঙ্গ	শ্রীবনফুল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১
১২।	বঙ্গ-দর্শন		৫৫

ORIENT LONGMANS

PRESENT

ALPONA—TARAN MOHAN CHATTERJI. With notes by TARAK CHANDRA DAS. The writer describes the legends and ceremonies connected with ALPONA—the traditional art of ritual decoration in Bengal. Rs. 3/-

POEMS OF LEE HOU-CHU—Rendered into English for the first time by LIU YIH LING and SHAHID SUHRAWARDY (with the English and Chinese texts on opposite pages). Lee Hou Chu, the last King of the Five Dynasties and Ten Kingdoms was the greatest Chinese poet of his time. Rs. 3/8/-

THE DOVE AND THE LEOPARD—W. G. ARCHER. A collection of Uraon poems and riddles translated into English with a note on the methods of Uraon poetry, Uraon marriages and the women's Hunt, by the author of the 'Blue Grove.' Rs. 10/8/-

AN ACRE OF GREEN GRASS—BUDDHADEVA BOSE. A review of modern Bengali literature. A fascinating study of the literary scene in contemporary Bengal covering every aspect, verse and prose and every notable author of our time. Rs. 10/8/-

ORIENT LONGMANS LTD.

BOMBAY : : CALCUTTA : : MADRAS

: টেলিফোন :
কাল ২৪৯০ অফিস
সাউথ ৬৩৪ কারখানা

টেলিগ্রাম :
'CIGIL'
CALCUTTA

কেমিক্যাল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লিমিটেড

থার্মোমিটার, থার্মোফ্লাস্ক, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে এবং
অন্যান্য ব্যবসায়ে ব্যবহৃত বাবতীয় কাচের জিনিষ এবং
সকল প্রকার কাচনির্ম্মিত যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারক

দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশনির্ম্মিত যন্ত্রপাতির চাহিদাও ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

শেয়ার এখনও পাওয়া যায়

শীঘ্র শেয়ারের জন্য আবেদন করুন

ম্যানেজিং ডিরেক্টার : — পি, কে, মুখার্জ্জি, এম-এ ; বি-কম (কাল্ট) :
আর-এ (ইণ্ডিয়া) ; এফ্-আর-ই-এস (লণ্ডন)

: অফিস :
২৮৫-এফ্, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

: কারখানা :
৩৪, গ্রিন্স্ অনেওয়ার সাহ্ রোড, টালীগঞ্জ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পপতিগণ কর্ত্তৃক উচ্চপ্রশংসিত

'কভেণ্ট্রি ভিক্টর'

ডিজেল এঞ্জিন

—: সেলিং এজেণ্টস :—

হার্ডওয়ার এ্যণ্ড্ ইলেক্ট্রিকেল্স্

লিমিটেড

১৯ ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোড, কলিকাতা

হিন্দুস্থান মার্ট

১৫৯।১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

সাধারণ বাজারের ঝামেলা-বিহীন আবহাওয়ায় আনন্দমুখর পরিবেশে
পুত্র-কন্যা-পরিবার-পরিজন সমভিব্যাহারে স্বচ্ছন্দে ও সুলভে আপনার

বাজার

এইখানেই করুন।

অলঙ্কার

আধুনিক রুচিসম্মত নানা প্রকার ডিজাইনের স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যের ব্যবস্থার।

ষ্টেশনারী ও প্রসাধন

যাবতীয় নানারকম রুচি ও উচ্চাঙ্গের প্রসাধন সামগ্রী, ফাউন্টেন পেন, পিওরেট কেস ও অন্যান্য ষ্টেশনারী, এবং জমাট দুধ, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি অত্যুৎকৃষ্ট ষ্টোর্স।

ঘড়ি

নিত্য নূতন ডিজাইনের নানা প্রকার রিষ্ট ওয়াচ এবং ক্লক, চেইন, বেল্ট ইত্যাদি।

লেদার গুডস্

ভ্যানিটী ব্যাগ, সুটকেস, বেল্ট, এবং অন্যান্য সৌখীন ও নিত্য ব্যবহার্য্য চামড়ার জিনিষ।

আসবাবপত্র

ফার্নিসার্স

বিবিধ রুচির ও ডিজাইনের মজবুত কাঠের তৈয়ারি টেবিল, চেয়ার, আলমিরা, খাট ইত্যাদি।

ফল ও ফুল

তাজা, সুরভিত ও সুমিষ্ট বারমাসী ফল এবং রকমারি ফুল ও ফুলের তোড়া ইত্যাদি।

সিল্ক, বস্ত্র ও পোষাক

নানা প্রকার ডিজাইনের সিল্ক ও উহাদের রকমারি শাড়ি এবং সর্ব্ব-প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ।

খদ্দর

সর্ব্বপ্রকার বিশুদ্ধ খদ্দর—বস্ত্র, সিট বিছানার চাদর ইত্যাদি।

জুতা ও ছাতা

লেডিস্ ও জেন্টস্ সর্ব্বপ্রকার সু, স্যাণ্ডেল, স্লিপার ইত্যাদি।

ফটোগ্রাফি

সুলভভাবে ফটো তোলা, ছবি বিক্রয় ও ছবি ফ্রেমিং।

বাসনপত্র

উৎকৃষ্ট এবং নিত্য ব্যবহারের কাঁসার ও পিতলের থালা, ঘটি বাটি ইত্যাদি।

রেষ্টোরেণ্ট

আধুনিক রুচিসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাগণের জন্য আরামপ্রদ রেষ্টোরেণ্ট।

মিষ্টান্ন

তাজা হিন্দু সন্দেশ, স্পঞ্জ রসগোল্লা এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর মিষ্টান্ন।

২নং হিন্দুস্থান মার্ট ৫ তলা বাড়ীতে ২০১।১-এ নং রাসবিহারী এভিনিউতে
শীঘ্রই খোলা হইবে।

হিন্দুস্থান মার্ট ১৫৯।১বি, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা

✦ ✦ ✦ প্লাই-উড্

চায়ের বাক্স তৈরীর কাজে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা
আজ সকলেই জানেন

কিন্তু

রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন — গৃহের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কাজে
প্লাই-উডের দান অপরিসীম.....
ঘরের মেঝেতে, দরজা ইত্যাদিকে **প্লাই-উডের** সাহায্যে অপূর্ব্ব
রূপ দান করা যায় এবং দক্ষ ডাক্ত-শিল্পিগণ অনেকেই
তৈরীর কাজে সর্ব্বদাই **প্লাই-উডের**
সহায়তা গ্রহণ করেন।

বেঙ্গল ববিন এণ্ড প্লাই-উড্ কোং
লিমিটেড

অফিস :
৪৪-৪৬ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফ্যাক্টরী :
যশোর রোড, দমদম

দেহরক্ষী

লিভার, প্রতিনিয়ত রক্তকণিকাগঠন, রোগ প্রতিরোধ, দূষিতপদার্থ শোষন, খাদ্যপরিপাক প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা আপনার দেহকে রক্ষা করে। আর আপনার লিভারকে রক্ষা করে "**কুমারেশ**"। '**কুমারেশ**', লিভারকে নীরোগ ও শক্তিশালী করিয়া, অম্লাশয়, অজীর্ণ, উদরাময়, সূতিকা, শিশুবক্ষ প্রভৃতি লিভার ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে এবং দেহের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে।

কুমারেশ

আপনার স্বাস্থ্য রক্ষায় একমাত্র সহায়

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ এণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

কুমারেশ হাউস

সালকিয়া ।। হাওড়া

গৃহের আসবাব

রুচির পরিচায়ক

卐

আসবাব তৈরীর কাজে
শিল্পী-দৃষ্টি আমাদের
বিশেষত্ব * জিনিষের গুণ
এবং
ভবিষ্যৎ ত্রুটি বিচ্যুতির
দায়িত্ব গ্রহণ করি

卐

আর্ট ফার্নিশার্স লিমিটেড

৩, সাদার্ণ এভিনিউ,

কলিকাতা

দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ নির্ভর করবে দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় উৎপাদনের উপর। দেশের সম্পদ বাড়াবার জন্য দরকার বিরাট গঠনমূলক পরিকল্পনা, আর সেই পরিকল্পনা সম্ভব করতে হলে চাই জাতীয় সঞ্চয়। এই বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব অপরিসীম।

যথাসাধ্য সঞ্চয় করুন

ও

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

আপনি এখন ৫, ৭ ও ১২ বছরের মেয়াদি সার্টিফিকেট কিনতে পারেন

সুদের হার যথাক্রমে : ৩½, ৩¾% ও ৪¼%

পোস্ট অফিসে খোঁজ করুন

(পশ্চিম-বঙ্গ ন্যাশনাল সেভিংস ডাইরেক্টরেট কর্তৃক প্রচারিত)

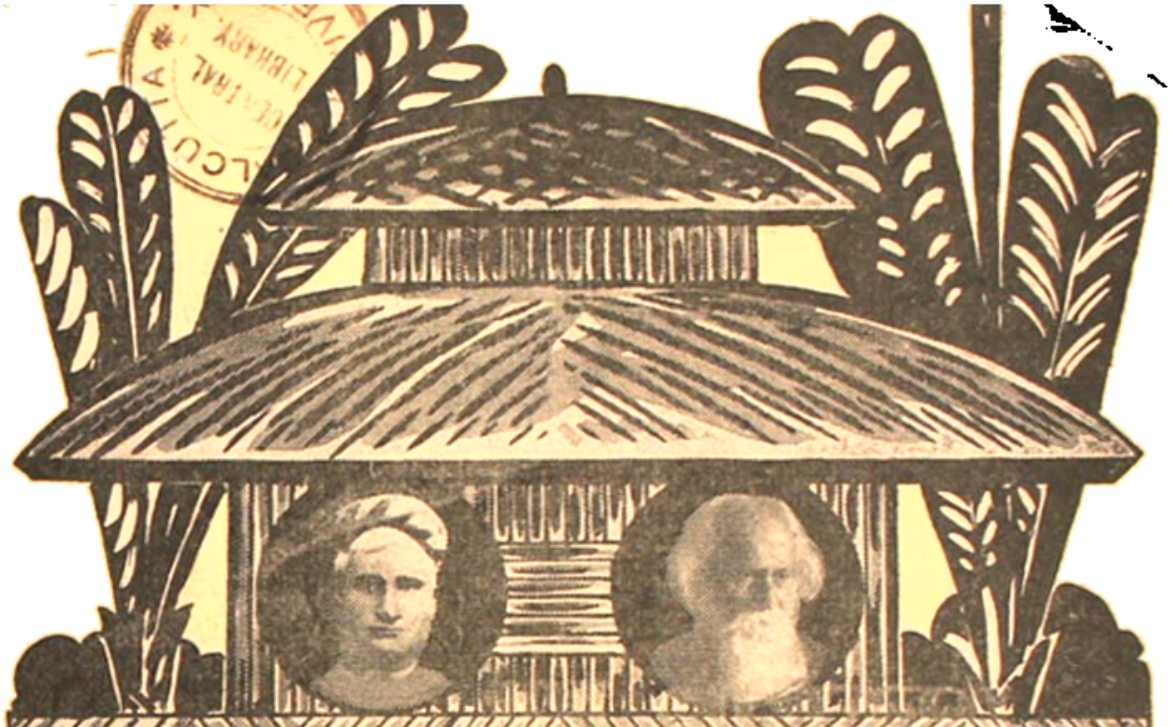

বঙ্গদর্শন

[দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৫৬]

রাজভক্তি

বঙ্কিমচন্দ্র

যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না; নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।

গৃহস্থ-পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তার ন্যায়, পিতামাতার ন্যায় রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না।

অতএব রাজাকে পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম্মে পুনঃপুনঃ রাজভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ম্মে হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির স্থান উচ্চ ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির সে স্থান নাই।

যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে একজন রাজা নাই — যে রাজ্যে সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলে বুঝিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার কংগ্রেসের বা বৃটিশ পার্লিমেণ্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেস ও পার্লিমেণ্ট ভক্তির পাত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্লস ষ্টুয়ার্ট বা দুই জনে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্তৎসময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্তৎ-প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র।

রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতায় সমাজের অমঙ্গল। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজপুরুষগণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মতঃ সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তারপর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে। কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য — একথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। আমাদের দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

রাজার অপেক্ষাও যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র। এই জন্যই কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধি বলে পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্তা, নীতি-বেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইঁহারা রাজাদিগেরও গুরু। রাজগণ ইঁহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তবে সমাজ-শাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে ভারতবর্ষে ভারতীয় ঋষিদিগের স্থান — এই জন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম — সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণ স্বরূপ। ইউরোপেও গ্যালিলীও নিউটন, কান্ত, কোমৎ, দান্তে, সেক্সপীয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।

বর্ষ 2 156·3
খণ্ড 2 ৩৩ 2।2
সং ১
প্রাপ্তি—
১৩৫৬

মধুমালিকা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী

অকূল পাথার বহিয়া চলেছে কোথায় সে নাহি জানি—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার উঠে আর নামে ময়ূরপঙ্খীখানি।
মাস্তুলে তার উড়িছে পবনে রূপালি রংয়ের পাল,
পিছনে বসিয়া জীবনকুমার ধরেছে সোনালি হাল।
নাও ব'য়ে যায়, পালে লাগে বায়, হালে কেটে যায় জল,
তলে তরঙ্গ হাসিবিভঙ্গে উচ্ছল ঝলমল।
দু'টি পাখা মেলি ময়ূরপঙ্খী উজান বহিয়া যায়,
হালেতে বসিয়া জীবনকুমার নাও বেয়ে গান গায়, —
"আর কতোদূর, কই গো আমার মধুমালিকার দেশ—
নাগিনীর বেণী বাঁধে যে-কন্যা — মেঘলবরণ কেশ?

"স্বপনে তাহারে দেখিয়াছি আমি, — হেন মোর
মনে লয়, —
সৃষ্টির প্রাতে ; ভোরের স্বপন কভু কি মিথ্যা হয়?
পারুল পরশি' বসেছিলো যেন হাসিয়া বিলাস-হাসি,
ঘুম ভেঙে দেখি—চ'লে গেছে সেই মোহিনী সর্ব্বনাশী।
তারি কণ্ঠের মাণিকের মালা পরা'য়ে আমার গলে,
আমার গলার মালাখানি ল'য়ে কখন গিয়াছে চ'লে!
অভিজ্ঞান এ-অঙ্গুরীখানি আঙুলে পরা'য়ে দিছে ;
চুনির চিহ্নে চিনেছি তাহারে,—স্বপন নহে গো মিছে।
অঙ্গ বেড়িয়া র'য়েছে এখনো তাহারি রঙস-রেশ —
নাগিনীর বেণী বাঁধে যে-কন্যা — মেঘলবরণ কেশ!

"কোন্ সে দেশের কুয়াশা-পুরীতে রহস্যময়ী থাকে?
কেন সে আমারে এমন করিয়া গান গেয়ে গেয়ে ডাকে?
বাতাসে তাহার সুর ভেসে আসে, প্রাণেতে প্রতিধ্বনি!
চুম্বকসম ল'য়ে যায় টেনে এ কোন্ আকর্ষণী?
যুগে যুগে মোর প্রিয়তমা সে যে, আমারি পরাণ-বঁধু,
অধরে তাহার তিক্ত গরল, চুম্বনে ভরা মধু।
দূরে ঠেলে দিয়ে ডাকে কাছে পে'তে — এ তার
প্রীতি-রীতি,
রাঙা সে বঁধুয়া এমনি বাড়ায় হিয়ার আরতি নিতি।
আর কতোদূর, কই গো আমার মধুমালিকার দেশ —
নাগিনীর বেণী বাঁধে যে-কন্যা — মেঘলবরণ কেশ?"

তারি ডাকে সে যে ছাড়িয়াছে ঘর, বেরিয়েছে
অভিসারে,
দেশে-দেশে তারে খুঁজে খুঁজে ফিরে আলোকে-
অন্ধকারে।
ঘাটে-ঘাটে ভিড়ে নাওখানি তার ; কূলে-কূলে কতো
লোক,
হারানো-রতন খুঁজিয়া বেড়ায় উৎসুক দু'টি চোখ!
এর মুখ দেখে, ওর চোখ দেখে, অশ্রু—কাহারো হাসি,
এর কথা শোনে, তার গান শুনে, কারো বীণ্—
কারো বাঁশী।
যারে চায় তার এতোটুকু মিল পায় না কাহারো কাছে,
আবার সাগরে ভাসায় সে ডিঙা — ঢেউ দোলে
পাছে-পাছে।
বুকে তারি আশা, মুখে তারি ভাষা, চোখে ভাসে
তারি দেশ —
নাগিনীর বেণী বাঁধে যে-কন্যা — মেঘলবরণ কেশ!

পিছনের মতো সঙ্গে ফেলে ময়ূরপঙ্খী তার
ছুটে চলে বেগে ; কভু আলো আসে, কখনো
অন্ধকার।

ঢেউয়ের নাগরদোলায় চাপিয়া হাহা হাসে কালো ঝড়,
ভয় লাগে মনে, ভাবে, — সে-ও বুঝি এমনি ভয়ঙ্কর!
ফিরে যেতে চায় ভুলে; তবু হায়, কিসের প্রবল টানে
অজ্ঞাতসারে বেয়ে চলে কেন অনঘপুরীর পানে।
স্বপ্নে-দেখা সে-বধূ লাগি' তার চির-অভিসার-বেশ!
মহা তমসার উপকূলে গিয়ে যাত্রা হবে কি শেষ? —
শুধু গান ভাসে: "কতোদূরে আর মধুমালিকার দেশ,
নাগিনীর বেণী বাঁধে যে-কন্যা — মেঘলবরণ কেশ?"

দূর সঞে তুঁহ বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঅ অভিসারে,
যাক পিয়া তুঁহ কি ভয় তাহারে,
ভয়-বাধা সব অভয় মূরতি ধরি'
পন্থ দেখাওব মোর।

— ভানুসিংহের পদাবলী

"বঙ্গদর্শন"

শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত

বঙ্গদর্শন : রূপদর্শন যদি রূপকে দেখা হয়, তবে বঙ্গদর্শন-এর অর্থ হয় — বঙ্গদেশকে দেখা। কিন্তু বঙ্গদেশকে দেখা বলিতে কাহার দেখা বুঝিব? প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর — যাঁহার দর্শন আছে, তাঁহার দেখা। দর্শনেন্দ্রিয় থাকিলেই দেখা হয় না, দর্শনের জন্য দ্রষ্টার প্রয়োজন। কাজেই, যিনি দ্রষ্টা, তাঁহার চোখ দিয়া বঙ্গদেশকে দেখাই প্রকৃত "বঙ্গদর্শন।"

দ্রষ্টার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ আবশ্যক। কোন বস্তু অথবা কোন ভাবের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ সুসাধ্য নহে। অনেক মনীষী এখন পর্য্যন্ত মনে করিয়া থাকেন যে, কোন কিছুরই প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ কস্মিনকালেও সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের মতে বস্তু ও গুণমাত্রেই আসলে অনির্দ্দেশ্য। তবু সংজ্ঞার প্রয়োজন আছে, নতুবা বিচার-বুদ্ধি পঙ্গু ও অন্ধ হইয়া পড়ে। 'দ্রষ্টা' তিনিই, দৃষ্টি বা দর্শন যাঁহার মুক্ত — খণ্ড স্থান-কাল-পাত্রের আবরণে দৃষ্টি যাঁহার আবৃত ও বদ্ধ নহে। প্রকাশে যাহা আছে এবং আভাসে যাহা রহিয়াছে, দুইই যাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তিনিই দ্রষ্টা। ইহাও উত্তীর্ণ হইয়া অন্তহীন কাল ও সীমাহীন অবকাশ এই 'দ্বৈত'-এর এক পটভূমিকায় যাঁহার দৃষ্টি লয় হইতে অভ্যস্ত — তিনিই দ্রষ্টা। সংক্ষেপে, মুক্তের দৃষ্টিই দ্রষ্টার দর্শন। ইঁহাদেরই এ-দেশে ঋষি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। 'ঋষি' শব্দের আভিধানিক অর্থও দ্রষ্টা। ঋষির দৃষ্টিতে যে-বাংলা ধরা পড়ে — তাহাই বঙ্গদর্শন। এই অর্থেই বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র "ঋষি বঙ্কিম" এবং রবীন্দ্রনাথ "ঋষি কবি।" এই ঋষির দৃষ্টির সম্মুখেই বঙ্গদেশ আপনার প্রকৃত স্বরূপ অনাবৃত করিয়া থাকে, কারণ "ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরেনা, ঋষির রসনা মিছে না কহে।"

দ্বিতীয় আর একটী অর্থ 'বঙ্গদর্শন'-এর হইতে পারে — বাংলার দর্শন। ঋষিবাক্য বলিতে যেমন ঋষির উচ্চারিত বাক্য, তেমনি বঙ্গদর্শন বলিতে বঙ্গের দৃষ্ট দর্শন বুঝাইতে পারে। বঙ্গ এখানে দর্শন-ক্রিয়ার কর্ম্ম নহে, স্বয়ংই দর্শন-ক্রিয়ার কর্ত্তা। বাংলা যাহা দেখিয়াছে, বাংলা যাহা দেখিতেছে এবং বাংলা যাহা দেখিতে চাহে অর্থাৎ দেখিবে — তাহাই বঙ্গদর্শন। সে-দৃষ্টা বা সে-দ্রষ্টাটী কি, যাহা বিশেষ ভাবে বাংলা দেখিতে চাহে, যাহাকে বিশেষ অর্থে বলা যাইতে পারে বাংলার — বঙ্গদর্শন?

ঈশ্বরেরও ঈক্ষণ বা দর্শন রহিয়াছে, তাই আবির্ভূত হয় — সৃষ্টি। ঈশ্বরের বিশেষ দর্শন হইল তাঁহার নিজের — সৃষ্টি। বাংলারও তেমনি যাহা বিশেষ ও নিজস্ব সৃষ্টি, তাহাই — বঙ্গদর্শন। এখানে বাংলা প্রথমে স্রষ্টা, পরে দ্রষ্টা। কিংবা এখানে বাংলা একাধারে যুগপৎ স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। সুতরাং, বাংলার সৃষ্টিকে বা বাংলার সৃজনীশক্তিকে অথবা বাংলার প্রকাশকে দেখাই — বঙ্গদর্শন।

যে-দুইটী অর্থ বঙ্গদর্শন-এর গৃহীত হইল, তাহাদের মধ্যে একটী পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে। দ্রষ্টার দৃষ্টিতে যে-বঙ্গদর্শন, তাহাতে দ্রষ্টার প্রাধান্য। আর বাংলার নিজের দৃষ্টিতে যে-বঙ্গদর্শন, সেখানে দৃশ্যের প্রাধান্য। আরও একটু সূক্ষ্ম ও গভীর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদর্শন-এর দ্বিতীয় যে-অর্থটী গ্রহণ করা হইয়াছে, সেখানে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ

প্রকৃত 'দর্শন'-এরও দ্বিতীয় কোন পন্থা বিদ্যমান নাই। কারণ, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের একাত্মতা ভিন্ন কোন দর্শনই কোন কালে সম্ভবপর হয় না। আরও একটু গভীরে প্রবেশ করিলে এই সত্যে উপনীত হইতে হয় যে, দর্শন মাত্রেই পরিণামে আত্মদর্শনে উপনীত হইতে বাধ্য। এই মূল সত্য স্বীকার করিলে বঙ্গদর্শন-এর যে দুইটী অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন বাস্তবিক ভেদ থাকেনা। কারণ, দ্রষ্টার অর্থাৎ ঋষির দর্শনও আসলে আত্মদর্শনই। সুতরাং বঙ্গদর্শন-এর সম্পূর্ণ ও প্রকৃত অর্থ হইল — বাংলার বা বাঙালীর আত্মদর্শন, ভাষান্তরে আত্মসৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ।

বাংলার দুইটী রূপ — একটী স্থানে, অপরটী কালে। স্থানে বাংলার যে-রূপ বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহাই বাংলার ভূগোল। আর কালে বাংলার যে-প্রকাশ উদ্ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাই বাংলার ইতিহাস। একই বাংলার দুই মূর্তি — ভূগোল আর ইতিহাস। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে, এই দুইটী মূর্তি স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন, অর্থাৎ ভূগোল আর ইতিহাস একেবারে পৃথক ব্যাপার। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। একেরই হইল দুইটী রূপ এবং রূপ পরিবর্তনে কখনও স্বরূপ পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ, বাংলার ভূগোল ও ইতিহাসে মূলে কোন তফাৎ ও পার্থক্য নাই। একই ধ্যান যখন স্থানে রূপ নেয়, তখন পাই দেশ, আর সে ধ্যান-মূর্তিকে যখন কালের পটে দেখি, তখন পাই ইতিহাস। একটী মূর্তি স্থানের তুলিতে অঙ্কিত, দ্বিতীয়টী অঙ্কিত কালের তুলিতে। যাহার পট, তিনি একই বাংলা—যিনি পটুয়া, তিনিও এক, শুধু হাতে তাঁহার দুই রঙের দুইটী তুলি।

বাংলার ভৌগলিক মূর্তির উপর দিয়া একবার সংক্ষেপে চোখ বুলাইয়া লওয়া যাইতেছে। ভারত-ভূমিকে আবহমান কাল হইতে দেবভূমি বলা হইয়া থাকে, ইনিই আমাদের 'জননী ভারতবর্ষ।' দৃষ্টি প্রসারিত ও স্থির রাখিলে একটী পরম বিস্ময় পরিলক্ষিত হইবে যে, ভূগোলের দিক দিয়া একমাত্র বাংলাদেশই ভারতভূমির সত্যিকার উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ একক কন্যা। চোখের ছোট দর্পণে যেমন বিরাট বস্তুর সমগ্রটুকু প্রতিফলিত হইয়া থাকে, বাংলার মধ্যেও তেমনি বৃহৎ ভারতভূমির সমগ্র মূর্তি ভৌগলিকভাবে প্রতিফলিত। ভারতবর্ষের মূর্তি — শীর্ষে হিমালয়, আর পাদপীঠে স্থাপিত নীল-সিন্ধু-পদ্মে। একমাত্র বঙ্গভূমিই বলিতে পারে যে, জননীর ন্যায় তাহারও শিরে হিমালয়ের শুভ্র তুষার-কিরীট, আর তাহারও পাদতলে নীল সমুদ্র। এই কন্যা-সৌরবে ভারতবর্ষের আর কোন দুহিতাই সৌভাগ্যবতী হইতে পারে নাই।

ঋষি বঙ্কিম বঙ্গজননীর বন্দনাস্তবে বলিয়াছেন — "বন্দেমাতরম্।" ইনি "সুজলা সুফলা, মলয়জ-শীতলা মাতা।" ইনি "কুসুমকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্, সুহাসিনীং ··· সুখদাং বরদাং মাতরম্।" কিন্তু ঋষির বন্দনাস্তবে কোথাও পাদবন্দনা নাই, নাই মায়ের জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলের বর্ণনা। মাতৃমূর্তির পায়ের এবং মুখের দিকে ঋষিসন্তানের দৃষ্টি কেন নিপতিত হয় নাই, ইহা আমার কাছে এক বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। ঋষির "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে যে ধ্যানমূর্তি উদ্ভাসিত, তাহা অসম্পূর্ণ, তাহাতে নিদারুণ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের ভারতভূমির বন্দনা তুলনায় শুধু পূর্ণতরই নহে, তাহা একটী সম্পূর্ণ স্তবমন্ত্র। ঋষি কবির ধ্যানালোকে যে জননী মূর্তি প্রতিভাসিত, তিনি "নির্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বল" "ভুবনমনোমোহিনী।" ঋষি কবি প্রথমেই মাতৃপাদবন্দনা করিয়া বলিয়াছেন, "নীল-সিন্ধু-জলধৌত চরণতল।" অতঃপর মায়ের প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঋষির দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেই স্তবস্পন্দনা উৎসারিত হইয়াছে — "অবনতশির ভাল হিমাচল,

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং।" কিন্তু যদি কবি যখন বঙ্গজননীর বন্দনাগান রচনা করিয়াছেন, সেখানে এই ধ্যান-দৃষ্টি উদ্ঘাটিত হয় নাই। তিনি শুধু মুগ্ধ সন্তানের আবেগে মাতাকে বলিয়াছেন, "ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।" আর শান্ত মনে প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন, "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল — পুণ্য হোক।" ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি কবি উভয়েরই মাতৃবন্দনায় কেন যে এই অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি রহিয়া গেল, তাহা আমার কাছে প্রকৃতই বিচিত্র ব্যাপার বোধ হয়। আমি জানি তাঁহাদের দৃষ্টি পূর্ণ, কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই অঙ্কিত মাতৃমূর্তি অসম্পূর্ণ অর্থাৎ সম পূর্ণ নহে।

ভূগোলকে আরও খানিকটা অনুসরণ করা যাইতেছে। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখিতে হইবে যে স্থান মাত্রেই দেশ নহে, এবং কাল মাত্রেই ইতিহাস নহে। বিশেষ একটা অবস্থার স্থান হইয়া উঠে দেশ এবং সময়ের একটী বিশেষ প্রকাশই ইতিহাস। নতুবা স্থান ও কাল দুইই রূপহীন ও কায়াহীন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ভূগোল হইতে হিমালয়কে অপসারিত করিলে কি হয়? ভারতভূমি তখন আর বাসভূমি বা দেশ হইতে সুযোগ পায়না। একটা অর্থহীন অবরুদ্ধ মাংসপিণ্ডের ন্যায় বদ্ধ্যা একটী ভূগোল পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ভারতবর্ষকে দেশ করিয়াছে হিমালয়। ঋষি কবি ইহা দেখিয়াছিলেন, তাই বলিতে পারিয়াছেন, "জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী।" হিমালয়ের স্তন্যরসে ভারতবর্ষ পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও পালিত। ভারতবর্ষের ভূগোলের ধারক ও বাহক হইল এই হিমালয়। ভারত-ভূমিকে যদি একটী বিরাট বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সে বৃক্ষের রসমূল হইল হিমালয়।

মহাকবি হিমালয়কে বলিয়াছেন — পৃথিবীর মানদণ্ড। ইহা হইল ভূগোলের মানদণ্ড। এই মানদণ্ডে সমগ্র ভারতবর্ষের ভূগোল বিধৃত। কিন্তু হিমালয় শুধু স্থানের অর্থাৎ ভূগোলেরই মাত্র ধারয়িতা নহে, ইতিহাসেরও সে মানদণ্ড। হিমালয়ের হৃদয়-রস বা স্তন্য-রস মানস-সরোবরে বা পয়োধরে সঞ্চিত। সিন্ধু-গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ধারাপথে সেই স্তন্যরস ভূমির পুষ্টি ও সৃষ্টির জন্য নামিয়া আসিয়াছে, ফলে ভারত-ভূমি জীবপালিনী ও জীবধাত্রী হইয়াছে। ইহা গেল ভারতবর্ষের ভূগোলে হিমালয়ের দান।

ভারতবর্ষের ইতিহাসও এই মানস-রসে পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও পালিত। ইতিহাসের স্থিতি কালে বা মনে অর্থাৎ স্মৃতিতে। ইহার সঙ্গে স্মরণ যদি করা যায় যে, হিমালয়ের মানস হৃদয়টী দ্রবীভূত রসরূপ পরিগ্রহ করিয়া যে-আধারে সঞ্চিত রহিয়াছে, তবে বুঝা যায় যে, কেন ঋষিরা তাহার নামকরণ করিলেন — "মানস সরোবর।" ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যদি পূর্ব্বের নাম বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সেই বৃক্ষেরও মানসিক মূল ঐ একই মানস-সরোবর।

স্থানে বা ভূগোলে ঐ মানস-রসধারা অবতরণের ফলে ভারতবর্ষ কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। এখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐ সলিলময়ী ধারার পাশাপাশি যে-মানসধারা প্রবাহিত, তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, একটু লক্ষ্য করা যাইতেছে। দেখা যায় সিন্ধু-নদের কূলে কূলে ভারতবর্ষের ব্রহ্মবর্ত্তের সভ্যতা বা ইতিহাস — দেখা যায় গঙ্গার কূলে কূলে ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতা বা ইতিহাস। হিমালয়ের স্বপ্ন এই ভাবে ভারতবর্ষের ভূগোলে ও ইতিহাসে বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

এই দৃষ্টিতে বাংলাকে দেখা যাক্। বাংলার ভূগোলে মানস-সরোবর হিমালয়ের হৃদয় হইতে রস লইয়া দুইটী ধারা নামিয়া আসিয়াছে — গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র।

ইহা হইল বাংলার ভূগোলের প্রথম বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মবর্ত্ম বা আর্য্যাবর্ত্তে একটীর অধিক দুইটী মানস ধারা অবতীর্ণ হয় নাই। বাংলার বুকে দুই দুইটী ধারা হিমালয়ের হৃদয় হইতে কেন নামিয়া আসিল? ইহা কি একটা অর্থহীন আকস্মিকতা? দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই — সিন্ধু ও গঙ্গার মিলন হয় নাই, কিন্তু বাংলাতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দুই ধারার মিলন ঘটিত হইয়াছে। ভূগোলের এই মিলন ইতিহাসেও সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু সে-ইতিহাস এখনও নেপথ্যে। হিমালয়ের যে-স্বপ্ন পূর্ব্বাহ্নে মানস-সরোবরে রস-ধারায় সঞ্চিত, তাহাই ক্রমে ক্রমে বাংলার ইতিহাসে ফলবান হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। তাহাই হিমালয়ের ভাবী স্বপ্ন — তাহাই ভারতবর্ষের আজও অপ্রকাশিত ইতিহাস, তাহাই পৃথিবীর নূতনতম আগামী সভ্যতা।

সিন্ধুর সভ্যতা আমরা দেখিয়াছি, গঙ্গার সভ্যতাও আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের সভ্যতার সাক্ষাৎ অদ্যাবধি পেয়া দেয় নাই। মানস সরোবর নামটীর পিছনে কবির সত্য দৃষ্টির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তেমনি ব্রহ্মপুত্র এই নামটীও লক্ষ্য করিবার। নাতিদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াই সিন্ধু ও গঙ্গা সমতল ভূমিকে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রকে দীর্ঘ, বন্ধুর, জটিল, পার্ব্বত্যাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া তবে ভূমিতলে নামিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই ব্রহ্মপুত্রের ধারাপথে হিমালয়ের যে-স্বপ্ন এই ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে, তাহাই বাংলার ইতিহাসে নূতনতর সভ্যতা ও সম্পদদেহে মূর্ত্তি লাভ করিবে। ইহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে আবার গঙ্গার ধারা। হিমালয়ের দুই চোখের দুইটী স্বপ্নের ধারা প্রথমে সঞ্চিত হয় মানস-সরোবরে; তাহাই আবার অবশেষে আসিয়া সম্মিলিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মিলনে — এই বাংলার বুকে।

এই যে দেখা, ইহা নিছক স্বপ্নবিলাস নহে, ইহা প্রকৃত দেখা, অর্থাৎ ইহাই প্রকৃত "বঙ্গদর্শন।" বাংলার গত একশত বৎসরের ইতিহাসের উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া লইলেই এই সত্যের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা অতীতের বাংলার দান বা সৃষ্টি। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের প্রধান দুইটি পরিচয় — প্রথম, দেশাত্মবোধ বা আত্মচেতনতা অথবা জাতীয়তা। তাহা এই বাংলারই হৃদয়-উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া ক্রমে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। দ্বিতীয় পরিচয় — আধুনিক বা পাশ্চাত্য অথবা বৈজ্ঞানিক সভ্যতা। বাংলাই ভারতের হইয়া এই সভ্যতাকে প্রথম গ্রহণ করে এবং অন্যান্য প্রদেশ বাংলার শিখা হইতে ধীরে ধীরে আপন প্রদীপে আলো জ্বালাইয়া লয়। অতীতের বাংলাই বর্ত্তমানের ভারতবর্ষে জীবন ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

আর বর্ত্তমানের বাংলা? মাটির ছুরার খুলিয়া কেহ যদি বাংলার গোপনঘর উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইতে পারিত, তবেই আমরা খবর পাইতাম, সেখানে কি আছে এবং কিসের আয়োজন চলিতেছে। ঐ গোপন ঘর হইতে দুইটী ধারা বাহির হইয়া প্রকাশ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে। রামমোহন হইতে সুরু করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ পর্য্যন্ত একটী ধারাকে অব্যাহত প্রবহমান দেখি। হিমালয়ের হৃদয়রসে যে-জ্ঞান যে-আলো যে-অমৃতবাণী রহিয়াছে, তাহাকেই এই ধারাপথে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আর একটী ধারাপথ ধরিয়া চলিয়াছে বীরের ও কর্ম্মীর দল — কানাইলাল-ক্ষুদিরাম হইতে সুরু করিয়া সূর্য্যসেনের সীমানাও উত্তীর্ণ হইয়া নেতাজীর তট পর্য্যন্ত তাহা অগ্রসর। বাংলার গোপনঘর হইতে জ্ঞানী ও বীরের দল বাহির হইয়া দুইপথ ধরিয়া চলিয়াছে। বাংলার হৃদয়-উৎস হইতে উৎসারিত

ইহাকে বলা যাইতে পারে — আলো ও শক্তির দুইটী ধারা।

বাংলার ভূগোলেও দুইটী ধারাকে দেখিয়াছি — গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। এখানেও বাংলার ইতিহাসে দুইটী ধারাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে — জ্ঞান ও শক্তি। ভূগোলের দুইটী ধারার মিলন হইয়াছে, কিন্তু বাংলার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত একাধারে এই দুইটী ধারার পূর্ণ মিলন সংঘটিত হয় নাই। যে-আধারে বা যে-ইতিহাসে তাহার মিলন সম্পাদিত হইবে, সেখানেই বাংলার নব আত্মদর্শন লাভ হইবে, তাহাই হইবে বাংলার নব আত্মপ্রকাশ। তাহাই "নব বঙ্গদর্শন।"

গঙ্গার ধারাপথে হিমালয়ের মাতৃহৃদয় বিগলিত হইয়া আসিয়াছে, ব্রহ্মপুত্রের ধারায় নামিয়াছে হিমাদ্রির পিতৃহৃদয়। বাংলায় আসিয়া এই দুইটী হৃদয় মিলিত হইয়াছে — "জগতঃ পিতরৌ" বলিয়া মহাকবি জগতের আদি মাতা ও পিতা রূপে ইঁহাদেরই বন্দনা করিয়াছেন। ভারতের ভূগোলে আর কোথাও হিমালয়ের দুই ধারার মিলন হয় নাই। ভারতের ইতিহাসেও তেমনি আর কোথাও মাতৃ ও পিতৃ দুই হৃদয় যুক্ত হয় নাই। বাংলার ইতিহাসে শিব-শক্তির পূর্ণ বাস্তব প্রকাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু সে প্রকাশ এখনও প্রকাশ্যে উদ্ঘাটিত হয় নাই। যেদিন তাহা হইবে, সেদিনই প্রকৃত "বঙ্গদর্শন" সম্ভব হইবে।

আমি একথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অর্জ্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে-আকর্ষণে বাঙালী তাহাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে — তাহাতে বাঙালীর সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালীর কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালীকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্টা-পাল্টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জ্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল —

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর"

— রবীন্দ্রনাথ

বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৯)

আমি অক্সফোর্ডে যে গৃহস্থের বাড়ীতে থাকি, তারা সামান্য রকম লোক, কিন্তু ভদ্র। কর্ত্তা প্রায় এক শত টাকা মাসিক রোজগার করেন — অর্থাৎ আমাদের দেশের ২৪।৩০ টাকার কেরাণীর মত অবস্থাপন্ন। গৃহিণী সুশিক্ষিতা — বিবাহের পূর্ব্বে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র। বড় মেয়েটি এক ফার্ম্মে কেরানীর কাজ করে। আমাকে এরা সকলেই খুব খাতির যত্ন করে। আমি একটি বড় ঘরে থাকি। ঘরটি ফুলদার রঙীন কাগজে মোড়া। মেজে কারপেট বিছান। একটি সোফা (Sofa) ইজিচেয়ার (Easy chair) তিনখানি গদি-মোড়া কেদারা, তিনটি ত্রিপাই (Tripoy) ও একটা বড় মেজ। দেওয়ালে খান বারো নানা রকমের ছবি সাজানো আছে। আর এক খানা গিলটির কাজ-করা ফ্রেমে-মোড়া বড় আরসি আছে, তাতে উঠতে বসতে আমার চাঁদমুখ দেখতে পাই। আহা যদি নিজেকে ভালবাসতাম তা হোলে কি আনন্দই না হোত! কিন্তু আমার কপাল এমনি মন্দ যে, যাদের সঙ্গে আমার ভারি ঘনিষ্ঠতা তারা প্রায় সকলেই আমার চেয়ে সুশ্রী — নয় গুণবান। তাই ছেলেবেলা থেকে নিজের উপরে বড় ভাব-ভক্তি হয় না। তবে চেহারা যে একেবারে মন্দ তা নয়, কিন্তু ভালবাসার মুগ্যি নয়। থাক্ নিজের কথা। ঘরটিতে দুটি জানালা। তাতে নেটের ফুলকরা পরদা টাঙ্গান। স্প্রিঙের এক-খানি খাট বেশ গদি-পাতা। দেশে কম্বলে মাদুরে শুয়ে বৈরাগ্য সাধন করতাম। এখানে বৈরাগ্য টৈরাগ্য কোথায় ভেসে গেছে। প্রাতে উঠে মুখ হাত ধুয়েই খাওয়া। দু পেয়ালা চা — চারি টুকরা রুটি, একতাল মাখন ও এক প্লেট পরিজ (Porridge) অর্থাৎ সিদ্ধকরা কোন শস্য — আমি রোজ বেলা ৮।৯ টার সময় উদরসাৎ করি। ইহাকে উপবাস-ভঞ্জন break-fast বলে। তারপর বেলা একটার সময় লাঞ্চ (lunch) অর্থাৎ মধ্যাহ্নের আহার। ভাত, ডাল, আলু-ভাজা, কপির তরকারী, রুটী, মাখন ও ফল ইত্যাদি খাই। আবার চারিটার সময় টোষ্ট অর্থাৎ রুটী মাখনে-ভাজা — কেক আর দু পেয়ালা চা অবাধে গ্রহণ করি। রাত্রি আটটার সময় ডিনার (dinner) অর্থাৎ প্রধান আহার। আমি প্রায়ই আলু বরবটি ও কলাই শুটির তরকারী, রুটী ও পুডিং (pudding) খাই। এখনও শেষ হয় নি। শোবার আগে এক পেয়ালা গরম দুগ্ধ পান করি। দেশে যদি এত খাই, তা হোলে দু চার দিনেই শমন-ভবন গমন করতে হয়। তবু আমি এখানে একজন সাধু। মাছ মাংস ডিম কিছু খাই না — কি কোরে বাঁচি তাই সবাই অবাক। এখান-কার নিরামিষাশীরা (vegetarian) ডিম খায়, কেন না ডিমের কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু এখানে যেমন খাওয়া, তেমনি পরিশ্রম করা চাই। দু সাত মাইল অন্ততঃ রোজ না বেড়ালে অসুখ করে। আমার

শরীর বেশ শুধরে গেছে। চেহারা লাল হোয়ে উঠেছে। কিন্তু মাসে ৫০টী করে টাকা দিতে হয়। এর চেয়ে সস্তা হয় না। গৃহিণী মাঝে মাঝে মিষ্টান্ন করেও খাওয়ান। আর ডিম খাইনে বোলে প্রায়ই ডিম না দিয়ে কেক্ তৈয়ারী করেন। কাপড় চোপড় নিজেই কেচে নেন — ধোপার খরচ লাগে না। বাড়িতে ইস্ত্রি করবার বন্দোবস্ত আছে। ইস্তের মোজা ছিঁড়ে গেলে খুব ভাল রকম নিজে রিপু কোরে নেন। গৃহিণী বড় পরিশ্রমী। দাসী নাই; সমস্ত দিন রান্না ও ঘরকন্নার কাজ তাঁহাকে করিতে হয়। আমার উপর এঁর কিছু ভক্তি হয়েছে। এক এক দিন সময় হোলে আমার কাছে এসে ধর্ম্মোপদেশ নেন। সংসারের ভাবনার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি কি প্রকারে মিশাইতে হয়, তাহা আমি একে বলি। তাই অনেকটা গুরুর মত সেবা পাই। ছোট ছোট মেয়েগুলি সদাই ব্যস্ত পাছে আমার খাবার-দাবারের কোন ত্রুটী হয়। বড় মেয়েটি একদিন আমার খাবার দিতে এসে তার কাঁধের উপর দিয়ে একটু নুন ছড়িয়ে দিলে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি। সে বললে যে আসতে আসতে নুন ফেলে দিয়েছিল। নুন ফেলা বড় অলক্ষণ। তাই ঐরকম কোরে অলক্ষণের কাটান করিতে হয়। আমাদের দেশেও অনেক স্থানে ঐরকম প্রথা আছে — যেমন তেল পড়ে গেলে, সেই জায়গায় একটু জলের ছিটে দিতে হয়। এখানে ঐ প্রকার অনেক সরল প্রথা আছে। সভ্যতার প্রকোপে আমাদের দেশে ভারতবর্ষে কত না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার-ব্যবহারকে কুসংস্কার বোলে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে। সভ্যতার দেশেই কিন্তু কুসংস্কার বেশী। গৃহিণীর এক ভগ্নী তার মামাতো ভাইকে বিয়ে করবে বোলে ক্ষেপেছে। মামা ভয়ানক চটেছেন। ছেলেকে বিষয় দেবে না বোলে ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রণয়িযুগল অটল। তাই গৃহিণী দুঃখ কোরে আমায় বলছিলেন যে, মামাতো পিসতুতো ভাই-বোনে বিয়ে বড় মন্দ। একটা ইংরেজিতে ছড়া বললেন — সেটা আমি ভুলে গেছি। তার অর্থ এই যে, ঐ প্রকার বিয়েতে স্বাস্থ্য ও অর্থনাশ হয় আর বন্ধ্যাদোষ হয়। বললেন — যতগুলো আমি দেখেছি, ততগুলো ঐরকম। তার সাক্ষী আমাদের পাড়াতেই এক ঘর বুড়া-বুড়ি স্বামী-স্ত্রী আছে। তারা খুড়তুতো ভাই-বোন। তাদের সব টাকা ও ব্যবসায় নষ্ট হোয়েছে — ছেলে-পিলে হয় নাই, আর তারা রোগে জীর্ণ। এত দেখে শুনেও তাঁর বোনের কেন এমন কুমতি হোলো তাই বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমরা সকলেই জানি যে, ইংরেজের প্রাণ অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি খাদ্য-দ্রব্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নির্ভরটা কত দূর তা বোধ হয় অনেকেই জানে না। বিলেতে প্রতি বৎসর প্রায় ছয় কোটি মণ গম আমদানি হয়। মার্কিণ মুলুক হোতে তিন কোটি মণ আসে। কানেডা হোতে পঁয়ষট্টি লাখ মণ ও হিন্দুস্থান হোতে ষাট লাখ মণ গম আসে। বাকি অন্যান্য দেশ যোগায়। গম ছাড়া ময়দা ১ কোটী ৮০ লক্ষ মণ। যবও প্রায় অত। জুয়ারি (Maize) তিন কোটি মণ। ভেড়ার মাংস দেড় কোটি মণ ও ১০ লাখ মণ শূকরের মাংস বিদেশ থেকে আসে — তাই ইংরেজের ব্যবসাগত প্রাণ।

মিষ্টার চেম্বারলেন এখানে এক ভারি গোল বাধিয়েছেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলেন যে, উপনিবেশের আমদানি মালের উপর মাশুল কম কোরে, অন্য দেশের মালের উপর মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। উপনিবেশ সকল আমাদের পরিবারভুক্ত, তজ্জন্য তাদের মাল ও দেশের মাল এক মনে করা উচিত। আর, তা হোলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ও উপনিবেশ সকলের সঙ্গে বন্ধন দৃঢ় হবে ও বৃটীশ সাম্রাজ্য বলশালী হবে।

এখন মুস্কিল এই যে, শস্য ও মাংস ও অন্যান্য নানা উপনিবেশ হোতে খুব কম আসে। তাই বিদেশীয় মালের শুল্ক বাড়াইলেই আহারীয় দ্রব্যের দর চোড়ে যাবে। এই কথা নিয়ে কাল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তুলুল বেধে গিয়েছিল। রাজস্ব-সচিব মিষ্টার গ্রিচি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে, ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি মিষ্টার চেম্বারলেনের প্রস্তাব অত্যন্ত অসঙ্গত। সচিবে সচিবে মতভেদ বড় দেখা যায় না। উদার পক্ষের (Liberal) মেম্বরেরা ভারি খুসি। গবর্ণমেণ্টকে খুব চেপে ধরেছে। আর গভর্ণমেণ্টের পক্ষের মেম্বরেরা অনেকেই চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর এক বিপদ। যে শিক্ষাবিধি (Education act) পাস হোয়েছে, তাতে লোকেরা ভারি চটেছে। ইংলিস চার্চ্চের (Church of England) বিরুদ্ধ সম্প্রদায়েরা (Nonconformist) মনে করে যে, এই বিধি অনুযায়ী চললে সব স্কুলই ইংলিস চার্চ্চের হাতে আসবে। তাই তারা সহরে সহরে ধর্ম্মঘট কোরেছে যে, শিক্ষার জন্য যে টেক্স্ তা কেউ দেবে না। বড় বড় লোক এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছে। যারা টেক্স্ দিচ্ছে না, তাদের আসবাব-পত্র সরকারে নীলাম করে টেক্স্ আদায় করছে; কিন্তু লোকে তবুও শুনছে না। বিদ্রোহ ক্রমশঃই বাড়ছে। ইংরেজ বিধির বড়াই করে, কিন্তু তারা ধর্ম্মহানির ভয়ে এবার বিধির বিরোধী হোয়েছে। গবর্ণমেণ্টের বড়ই বিপদ।

ইংরেজ হিন্দু জাতিকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছে। জাতি যেরকম না হোলেই কাফ্রি বা জুলুদের মত অসভ্য — এইরূপ এদের ধারণা ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে এসে তারা সে ধারণাটা ঠিকরে পোষণ করতে বড় সুবিধা পায় না। হিন্দুজাতি যে ইংরেজের অপেক্ষা সভ্য, তার আর কোন সন্দেহ নাই। এবিষয়ে পদে পদে এদের চোক ফুটেছে, কিন্তু পূর্ব্ব-সংস্কার ছাড়তে চায় না। আমরা ইংরেজ বা ইয়ুরোপীয় — আমরাই সভ্য — আর সব অসভ্য — এই বুলি। ডাক্তার ফেয়ার বেয়রণ (Dr. Fairbairn) ও ডাক্তার ড্যাড (Dr. Dadd) আমাদের দেশে ধর্ম্ম শিখাইতে গিয়াছিলেন। ভাল কথা। কিন্তু গিয়ে দেখিলেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম তাঁদের ধর্ম্মের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। তাই বড় একটা পসার হোলো না। এই রাগ। দাও গালাগালি হিন্দুদিগকে। ডাক্তার ফেয়ার বেয়রণ উচ্চপদে আছেন; বেদান্তের সম্বন্ধে জানিতে এখানে অনেক অধ্যাপক উৎসুক, কিন্তু ইনি একেবারে বীতরাগ। হিন্দু ধর্ম্মের উপর এঁর কিছু শ্রদ্ধা নেই। তবে সুখের বিষয় এই যে, এখানে ইনি গায়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল গোছের লোক। আমাদের দেশের লোক মনে করেছিল যে, কোন একটা দিগ্‌গজ এসেছে। কিন্তু উচ্চপদে এঁর প্রতিপত্তি ভারি কম। ডাক্তার ড্যাড ত স্পষ্ট লিখেছেন যে, হিন্দুরা মিথ্যাবাদী ও দুশ্চরিত্র। যে ইংরেজ ভারতে যায়, সেই হিন্দুর বিষয় কিছু না কিছু লেখে। এখানে এত বই বেরিয়েছে যে, আমরা তার খবরই জানি না। কিন্তু প্রায় সবগুলি হিন্দুর নিন্দায় ভরা। এর উপায় কি? উপায় রাজা পায়। আমাদের দেশীয় ধুরন্ধরেরাও হিন্দুর নিন্দা করিতে ছাড়েন না। রমেশ বাবুর 'হিন্দুর সভ্যতা' নামক পুস্তকখানিতে হিন্দুর নামকে যে কি ঘাটি কোরেছেন তা বলা যায় না। তাঁর গ্রন্থের মর্ম্ম এই যে আমরা কোনও পুরাকালে একটু আধটু সভ্য ছিলাম — তা আবার সে সভ্যতাটুকুও ব্রাহ্মণের অত্যাচারে লোপ পেয়েছে। যাক, তাঁর আর নিন্দা করিব না। তিনি দেশ-হিতৈষী। ইংরেজের কাছে তিনি আমাদের দারিদ্র্যের ওকালতি করেন — তাঁর মঙ্গল হোক।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে বেদান্তদর্শন শিক্ষা হয়, সেই বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা

করিতেছি। যদি হয় ত বড় ভাল হয়। কতকগুলো বিলাতী ভুতুড়ে লোক আর বিলাতী মেয়েমানুষের হাত থেকে হিন্দুস্থানির পাণ্ডামিরি যত দিন না যায়, তত দিন অমঙ্গল বই মঙ্গল নয়। যারা উচ্চশিক্ষিত তারা ঐ অর্দ্ধশিক্ষিত প্রেতাত্মা-মহাত্মা-গ্রস্ত উদ্ভূটে বিলাতি হিন্দুদের কৃপা করে। এই পাণ্ডার দল — দর্শন কি বস্তু, তার বড় খোঁজ রাখে না; কিন্তু কেবল নিজেদের দেশের নিন্দা ও কুৎসা করে, আর না বুঝে সুঝে হিন্দুর বিরুদ্ধে চীৎকার করে। যত স্বদেশদ্রোহী আর নব-নব-কৌতূহল-বিলাসিনী নারীদের দ্বারা এই দল পরিপুষ্ট। হিন্দুত্বের যে এখানে কি দুর্দশা — দেখলে বড় কষ্ট হয়। অথচ আমাদের দেশে হৈ চৈ পোড়ে গেছে যে, বিলেতে হিন্দুয়ানির আদর বাড়ছে।

উৎপারে দার্শনিক সভা আমায় নিত্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। অনেক অধ্যাপক এই সভায় আসেন। এই রকম বলিতে বলিতে যদি কিছু ফল হয়। আগামী রবিবারে ঐ সভার অধিবেশন হবে। ইতি। উৎপার ১২ই জুন ১৯০৩। বি, উপাধ্যায়।

প্রজাকে তাহার সামাজিক গণ্ডীর বন্ধনী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বিজেতার অনিচ্ছীভূত করিতে হইলে, তাহার জাতি-কুল নাশ করিতে হইলে, তাহার সমাজগত সংহতি-শক্তি চূর্ণ করিতে হইলে, তাহার সম্মুখে বিজেতা-জাতির সকল বিষয়েরই অধিক মাত্রায় শ্লাঘা প্রকাশ করিতে হয়, এবং প্রজার সকল বিষয়ের, সভ্যতার সকল প্রত্যঙ্গের ঘোরতর নিন্দা করিতে হয়। রাজার জাতির মুখে প্রজার সাজ-পোষাক, সভ্যতা-ভব্যতার নিন্দা অহরহ শুনিতে থাকিলে — প্রজার কর্ম্ম-কলেবর আবরণ যদি না থাকে, তাহা হইলে ক্রমে প্রজা খিসড়ায়, স্বীয় জাতি কুল-ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া বিজেতা-জাতির অঙ্গীভূত হইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। একবার বিজেতার অঙ্গীভূত হইবার বাসনা মনে জাগিলে, পরাজিতের বিশিষ্টতা রক্ষা পায় না। মোগল পাঠানের আমলে এমন প্রজা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিত; ইংরেজের আমলে এমন প্রজা হ্যাট-কোট প্যাণ্টুলুন পরিহিত বিলাতী হাবভাবপূর্ণ সাহেব সাজে।

— পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

আকস্মিক

শ্রীনলিনীকুমার বসু

বেহারে যিনি একাগাড়ী না চ'ড়েছেন তিনি তার বলা বুঝবেন না। ঝাঁকুনিই লাগুক আর ঠোক্করই লাগুক, সর্ব্বক্ষণ একার প্রতি অনন্যমনা হ'য়ে আরোহীকে স্থিতিবান থাকতে হবে। একটু-খানি অনবধানী হ'লেই হয়—তিনি পেছন দিক থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে পাকা রাস্তার বুকে চিহ্নিত হবেন, না হয়ত সুমুখের দিকে বাহু প্রসারিত করে অশ্বিনীকুমারের পদাশ্রয় গ্রহণ ক'রবেন। কোন ব্যবস্থাই, অবশ্য, সুখকর নয়। স্থিতিবান থাকার প্রয়োজনে রীতিমত রাহুর প্রেম নিয়ে একাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখাই রীতি। সকলের জন্য এই একই রীতি কিনা জোর ক'রে বলা না গেলেও, অসীমের পক্ষে এই একমাত্র ব্যবস্থা। একার বাড়ী ফেরার পথে, অবিকল এই কথাগুলি না হ'লেও অনুরূপ কতগুলি কথা তার মনে আসছিল।

বাপের মৃত্যুর পর জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কর্ম্মকুশলতায় যখন প্রায় সমস্ত অর্থ-সম্পত্তি খুইয়ে, মায়ের আঁচল ধরে বেহার মুল্লুকে এই মামার বাড়ী এসে আশ্রয় নেয়, তখন তার বয়স পাঁচ বছর। পঁচিশ বছর আগেকার কাহিনী, স্পষ্ট মনে থাকারও কথা নয়। শুধু মনে আছে, একটু বড় হ'য়ে বহুবার বহুজনের কাছ থেকে শুনেছিল—একমাত্র মামার একমাত্র ভাগ্নে হওয়া নাকি ভাগ্যের কথা। কথাটার মধ্যে হয়ত খোঁচা ছিল, কিন্তু অসীমের তখন ঐ খোঁচায় আহত হওয়ার বয়স নয়। মামার একমাত্র ভাগ্নে হওয়া যে ভাগ্যেরই কথা, এই বিশ্বাসই তার ছিল। চব্বিশ বছর পর্য্যন্ত এই মামার বাড়ীতে তার দিনগুলি কেটেছে নিশ্চিন্ত আরামে। একটা মসৃণ পথে চলে এসেছে যে, আশে-পাশে চেয়ে দেখারও অবসর বা ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু, চব্বিশ বছরের পর সহসা একটা ছেদ পড়েছে। মায়ের মৃত্যু হয় এই বছরেই। ইতিমধ্যে বি, এ পাশটা সে সেরে রেখে-ছিল, তবে ঐ পর্য্যন্তই—বিদ্যাবুদ্ধি বা চাকুরীবল, কোথাও আর তার জানাশোনা ছিল না। প্রথমটায় আপত্তি ছিল মামা-মামী উভয়ের, দ্বিতীয়টায় পৌঁছানোর অক্ষমতা তার নিজেরই। যা ক'রতে কোন অসুবিধা নেই—চাকুরীর জন্য দরখাস্ত —তা সে নিয়মিতই পাঠিয়ে আসছে। সবগুলির হয়ত উত্তর আসে না। তবু তা ভাল; যেগুলির আসে তাই অসীমকে কিছুকাল অস্বস্তিতে ফেলে রাখে। সেগুলি আসে প্রায়ই দেখা করার আহ্বান নিয়ে। বহুক্ষেত্রে দেখা করার নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই অসীম আবিষ্কার ক'রে ফেলে—ও-চাকুরীগুলি হয় নিতান্ত বাজে, না হয়ত ও-গুলিতে উন্নতির কোন আশা নেই। অসীমের মুস্কিল ঐ-ই। অথচ, কিছু একটা তার করা দরকার। মামীমার বিরক্তি যেন দিন-দিনই আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসে যাচ্ছে। মামার জন্য অসীমের মনে কোন দুশ্চিন্তা নেই, যা কিছু আশঙ্কা মামীমার দিক থেকে। সংসারের ব্যাপারে মামা বিশেষ কিছুতেই থাকেন না, পেনসন নেওয়ার পর থেকে তিনি ধর্ম্ম-কর্ম্মেই মন দিয়েছেন বেশী। পরমার্থিক ব্যবস্থা যেমন মামার হাতে, আর্থিক ব্যবস্থা তেমনই মামীর হাতে। সংসার এতে অবশ্য মন্দ চলে না, অসুবিধা শুধু অসীমেরই। ত্রিশ বছর বয়সেও না পারল সে বাড়ী থেকে বেরুতে, না পেল কোথাও একটা চাকুরী। এমন কি, যে

ব্যাপারে বিশেষ কোন উমেদারী বা সাহসের দরকার হয় না—একটা বিয়ে করা—তা-ও অসীমের হয়ে ওঠেনি। তার জন্য খুঁজে-পেতে কেউ বনে নিয়ে আসবে, এমন আশা অসীমের মনে ছিল না। বইয়ে পড়া, কানে শোনা দু'চারজনের মত নিজের সঙ্গিনী খুঁজে নেওয়ার কথা সে ভাবতে পারে না। তা' অসম্ভব — একেবারে অসম্ভব। সে সব অতি বিশ্রী ব্যাপার। আর যদিই বা এমন দুর্বুদ্ধি কখন তার হয়, স্ত্রী নিয়ে সে উঠবে কোথায়? সেই ত মামীমার বাড়ী! এর চেয়ে অসমসাহসিক, অসম্ভব কথা আর কিছু হ'তে পারে বলে ত' অসীমের মনে হয় না। —

"বাহোবা পান্নালাল — !"

চম্‌কে উঠে অসীম আলিঙ্গন আরও দৃঢ় ক'রে বসল। এক্কাওয়ালা সোল্লাসে তার ঘোড়াকে উৎসাহ দিচ্ছিল। মনিবের উৎসাহ রক্ষার্থেই হোক্ বা অসীমের অন্যমনস্কতার আঁচ্ পেয়েই হোক্, 'পান্নালাল' আচম্‌কা দ্বিগুণ জোরে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। য়ে-বসে দু'পাশের দৃশ্য দেখতে-দেখতে যাওয়ার প্রয়োজন অসীমের ছিল না। সেই কলিমনসার বেড়া আর ভাঙ্গা-আধভাঙ্গা মেটে বাড়ী কোনদিনই তাকে আকৃষ্ট করেনি। 'পান্নালালে'র আচম্‌কা উৎসাহে অসীমের তেমন কোন আপত্তি ছিল না, শুধু যা' একটু আত্মরক্ষা ক'রে বসা। আর যা' কিছু সামান্য আপত্তি ছিল, তা' এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাওয়া।

মামীমা আসা-যাওয়ার এক্কা-ভাড়া গোটা একটা টাকা দিয়ে তাকে ষ্টেশনে পাঠিয়েছিলেন সেই ভোর ছটায়। মামীমার বোন, ভগ্নীপতি আর তাদের একমাত্র মেয়ের আসার কথা ছিল সাতটার গাড়ীতে। বড়জোর পাঁচ-দশ মিনিট তার দেরী হ'য়েছিল, কিন্তু অবাক হ'য়ে শুন্‌ল, গাড়ী নাকি ইতিমধ্যে পৌঁছে আবার চলে গিয়েছে। গাড়ীর হঠাৎ এতটা নিয়মানুবর্ত্তিতা অসীমকে সত্যই অবাক ক'রে দিয়েছিল। এখন তার একমাত্র ভরসা — আগন্তুকদলের গাড়ী ফেল করা। অসীমের যতদূর মনে পড়্‌ছিল—পরিচিত, অপরিচিত সকলেই গাড়ী ফেল করে, ফেল করে না এমন কোন ব্যক্তির কথা সম্প্রতি অসীমের মনেই পড়ে না, যারা করে না তারা খুব সম্ভব নৈমিক যাত্রী। মামীমার আত্মীয়গণও গাড়ী ফেল করেছেন, এই বিশ্বাস নিয়েই সে ফিরে আসছিল।

কিন্তু পথিমধ্যে তার বিশ্বাস ভঙ্গ হ'ল। — 'পান্নালাল' জোরে ছুটতে-ছুটতে সম্মুখবর্ত্তী যে ফিটন্ গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে, আর 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি' মনোভাব নিয়ে সহসা থেমে দাঁড়াল — সেই গাড়ীতেই যাচ্ছিলেন অসীমের মামীমার বোন-ভগ্নীপতি। সস্ত্রীক বিধুবাবু অসীমের দিকে চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বল্‌লেন, "অসীম না!" অসীম মুহূর্ত্তমধ্যে এক্কা থেকে লাফিয়ে পড়ে' পরমুহূর্ত্তে ফিটনের পাদানিতে উঠে বস্তুরমত হাঁপাতে লাগল। বিধুবাবু বল্‌লেন, "ভিতরে এসে ব'স।" স-কন্যা তিনি যে আসনে বসেছিলেন, তারই কিছুটা অংশ অসীমকে ছেড়ে দিলেন। সুমুখের আসনে ছিলেন অসীমের মামীমার বোন আশালতা দেবী, আর — ; আশালতা দেবী পরিচয় দিলেন. "মিনুর শিক্ষয়িত্রী মিস্ দত্ত, গুড্ ফ্রাইডের ছুটির এই ক'টা দিন আমাদের সঙ্গেই কাটিয়ে যাবেন।" — পরিচয়টা যেন অসীমের কাছে বাহুল্য মনে হ'ল; ইনি যে শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষয়িত্রী ছাড়া আর কিছু নন্, তা' যে-কেউ প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারবে। এমন কি, তাঁর বয়স পঁচিশ কি ত্রিশ, সুন্দর কি সুন্দর নয় প্রভৃতি কথাগুলিও মিস্ দত্তের সুমুখে ব'সে অবান্তর মনে হ'বে। — অসীম হেসে বললে, "মিনুকে ত' এখন চেনাই যায় না, সেই কবে সাত-আট বছর আগে দেখেছিলাম!" মিনু তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে,

"ছোটমাসীর বিয়ের সময় অসীমদা ক'লকাতায় ছিলেন না ?" — অসীম আরেকবার দেখে নিলে মিস্ দত্তের সাঁথির লাল রঙের কোন চিহ্ন নেই। থাকলেই হয়ত যা বেমানান হ'ত। বয়স ওঁর পঁচিশের বেশী যদিও বা না হয়, কোনমিন যে কম, এই মিথ্যে মত বা তার চেয়ে কম ছিল, এই কথাটা বিশ্বাস করা যেন অসীমের পক্ষে সহজ মনে হচ্ছিল না। সম্ভব-অসম্ভব বড় কথা নয়, আসল কথা স্বাভাবিক ভাবে মনে হওয়া। আরেকবার চেয়ে দেখবার কৌতূহলকে বাধা দিতে অসীম মনে-মনে আবৃত্তি সুরু করলে, "কোন কালে ছিলে নাকি বুকুলিকা বালিকাবয়সী —"

মায়ের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে মিনু অসীমকেই জিজ্ঞাসা ক'রলে, "চিনেন ?" অন্যমনস্ক অসীম প্রশ্ন শুনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিনুর দিকে ফিরে চাইল। মিনু হেসে ব'ললে, "আপনাকেই জিজ্ঞেস্ করছি, — ছিলেন তখন ?" "আমাকে ! কোথায় ছিলাম ?" বিস্মিত অসীম পাল্টা প্রশ্ন ক'রলে "ছোটমাসীর বিয়েতে, ক'লকাতায় ?" এবারে অসীম হেসে উত্তর দিল, "ও—হ্যাঁ, ছিলাম ত'। তুমি তখন খুব ছোট, ফ্রক্ পরতে।"

দুপুরের শেষ দিকে অসীম তার নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে নিবিষ্ট মনে একখানা বই পড়ছিল। তার পায়ের দিকে বেশ একটু উঁচুতে ঘরের একমাত্র জানালা দিয়ে পড়ন্ত বেলার রোদ এসে বিছানায় পড়েছে। — দোরের ওপাশ থেকে মেয়ে-গলার সাড়া এল, "কি কর্চ্ছেন ? ভিতরে আসতে পারি ?" তখনই অসীমের কোন উত্তর বুঝে এল না, এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। তবু চুপ ক'রে থাকা সম্ভব নয়, সোৎসুক কণ্ঠে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হ'ল, "আসুন, আসুন, দোর খোলাই আছে।" স্মিতমুখে মিস্ দত্ত ভিতরে এলেন এবং একখানা হাতলহীন-চেয়ারে বসে ব'ললেন, "কি অত মন দিয়ে পড়ছিলেন ?" অসীম উঠে বসেছিল, তার আড়ষ্টতা তখন আর নেই। সহজস্বরে হেসে ব'ললে, "শুধু পড়ছিলাম তা' নয়, একটা এক্সিডেণ্টের সম্ভাবনা মন দিয়ে অনুসরণ কর্ছিলাম।" "এক্সিডেণ্ট !" বুঝতে না পেরে মিস্ দত্ত প্রশ্ন ক'রলেন, "বইয়ের ভেতর ?" বইখানার দিকে একবার চেয়ে অসীম ব'ললে, "হ্যাঁ, — কি জানেন, দেখ্ছিলাম রবিঠাকুরের কীর্ত্তির রথ কি রকম টাল্ খেতে খেতে সাম্লে নিলে।" বিস্মিতস্বরে মিস্ দত্ত ব'ললেন, "পড়ছিলেন ত' দেখ্ছি 'সোরা', টাল্ খাওয়া কোথায় দেখ্লেন ?" "এই বইয়ে — পরেশবাবুদের গাড়ী কেমন সময় বুঝে যথাস্থানে এসেই গোলমাল হ'য়ে গেল ; এমন সস্তা কৌশল যে শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মাথায়ও আস্তে পেরেছে, এই কথাটাই আমাকে রীতিমত মুস্ড়ে দিয়েছিল।" তরল হাস্যে মিস্ দত্ত ব'ললেন, "এই কথা !" "কম কথা নয়। — পরে মীমাংসায়ও অবশ্য পৌঁছেছি ; — বুঝ্তে পেরেছি ওটা শুধু গাড়ীর ঝাঁকুনি নয়, রবিঠাকুর যেন একটা হাঁচ্কা টান মেরে তাঁর গল্পের অন্দর-মহলের দোরে নিয়ে এলেন আমাদের। এই মীমাংসায় এসেই না বেঁচেছি !"

— মিস্ দত্ত কোন উত্তর দিলেন না, ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটিতে একবার চোখ বুলিয়ে, একমাত্র জানালা দিয়ে যে বাঁজেপোড়া একটিমাত্র তালগাছ দেখা যায়, তা'থেকেও দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে নীরবে বসে ছিলেন। অসীমই আবার বল্লে, "কিছুই বল্ছেন না ত' ?" অসীমের দিকে চেয়েই মিস্ দত্ত বল্লেন, "যদি কিছু মনে না করেন ত' বলি —" সঙ্গে সঙ্গে অসীম ব'ললে, "মনে করার হ'লে যদিও বা করি, ব'লতে আপনার কোন বাধা নেই।" 'আমার কি মনে হয়েছে জানেন ? আপনি এ বাড়ীতে থেকেও যেন একা।" রবীন্দ্রনাথের

সমালোচনা নয়, নিতান্তই অসীমের ব্যক্তিগত কথা! তবু, সহজস্বরেই সে উত্তর দিল, "শুধু এ বাড়ীতে কেন, সব জায়গাতেই — ভিড়ের মাঝেও — আমি একা।" শেষের দিকের কথাগুলিতে মনে-মনে অসীম একটু অস্বস্তি বোধ ক'রলেও মুখের ভাবকে সে সহজই রেখেছিল। বোধ করি হাতের কাছে আর কোন উপযুক্ত কথা না পেয়ে মিস্ দত্ত প্রশ্ন ক'রলেন, "আপনি চাকুরী করেন?" অম্লান মুখে অসীম বললে, "না।" — তার মনে বেপরোয়া হওয়ার একটা ইচ্ছা যেন একটু একটু ক'রে মাথা উঁচু করছিল। মিস্ দত্ত আবার প্রশ্ন ক'রলেন, প্রশ্নটা শুধু অবান্তর নয়, অশোভনও বটে, "কেন করেন না?" "পাচ্ছিনা ব'লে।" "পাচ্ছেন্ না!" "তাই ত দেখছি," অসীম হাসিমুখেই উত্তর দিল, "আপনি মনে মনে একটা কোন আঁচ করেছেন হয়ত; ভুল ক'রবেন না, না পাওয়াটা আমারই অক্ষমতা।" — হল্-ঘরের প্রান্ত থেকে ওপাশ থেকে হরির মা ডেকে বললে, "দাদাবাবু, মা একবার আপনাকে দোকানে যেতে ব'ললেন, একটা দাল্দা নিয়ে আসতে হ'বে" — এগিয়ে এসে মিস্ দত্তকে দেখে প্রথমে মাথার কাপড় একটু টেনে দিল, পরে কণ্ঠস্বরকে নীচুতে এনে আবার ব'ললে, "উঠুন্ দাদাবাবু।" অসীম টেবিলের উপর থেকে চোখ তুলল না। হরির মা এবারে মিস্ দত্তকে বললে, "মা আপনাকে খুঁজছেন, সকলে চা নিয়ে বসে আছেন।" মিস্ দত্ত কিছু না ব'লে উঠে চলে গেলেন। অসীম চোখ না তুলেও তাঁর নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করেছিল। হাতের বইখানা খুলে সে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। হরির মা তাড়া দিয়ে বললে, "ওকি! আবার শুলেন যে! যান্ শীগ্‌গির, মা রাগ ক'রবেন।" অসীমের উঠতে হ'ল।

পরদিন দুপুরে একখানা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ার আগে অসীমের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল তার অগোছালো ছোট ঘরখানার দিকে। বই রেখে সে উঠে বস্‌ল। প্রথমেই বিছানার চাদরখানাকে ঝেড়ে উল্টে নিয়ে পাত্‌ল। পরে, টেবিলের উপরের বইগুলি নামিয়ে সযত্নে ধূলা ঝেড়ে আবার একটি একটি করে সাজিয়ে রাখল। আরেকবার বিছানা আর টেবিলের দিকে চেয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে বসল। সাজিয়ে-রাখা বইগুলির ভিতর থেকে পূর্ব্বের হাতে-নেওয়া বইখানি সন্তর্পণে তুলে এনে ব'সে ব'সেই পড়তে আরম্ভ করলে।

আজও দুপুরের শেষ দিকে মিস্ দত্ত এলেন। দোর খোলা ছিল ব'লে কোন সাড়া না দিয়েই তিনি ভিতরে এসেছিলেন। বই বন্ধ ক'রে অসীম মুখ তুললে। হাসিমুখে মিস্ দত্ত বললেন, "আপনি বড় অন্যমনস্ক!" অসীমও হেসে বললে, "অন্যমনস্ক! আগে ত ছিলাম বলে মনে পড়ে না। হয়ত আজকালই হয়েছি।" টেবিলের উপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে মিস দত্ত বললেন, "কথাটা কেমন হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে।" "হেঁয়ালীর মত? হবে হয়ত। অন্যমনস্ক হওয়ার কারণটাই হয়ত হেঁয়ালীর পর্য্যায়।" — আজ অসীমের মনে হঠাৎ বেপরোয়া হওয়ার ইচ্ছাটা সোজা উঠে দাঁড়িয়েছিল। মিস্ দত্ত বইর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, "কারণটাই যখন হেঁয়ালী, বাইরের লোকের শুনবার অধিকার হয়ত নেই।" অসীম মিস্ দত্তের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললে, "শুনলে আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন, না হয় আমার ধৃষ্টতায় মনে মনে হাসবেন।" "বেশত—বলেই না হয় দেখুন্ —" মিস দত্তের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু বই থেকে চোখ তুললেন না। সামান্য একটু সময় চুপ ক'রে থেকে অসীম বললে, "যদি বলি আমার অন্যমনস্কতার কারণ আপনি?" — কথাটা বলার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও মনে যে সাচ্ছন্দ্য ছিল ব'লে ফেলার পরই তা' যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে চোখে-মুখে

আশঙ্কার অস্পষ্ট ছায়া নেমে এলো। — চোখ তুলে মিস্ দত্ত বল্লেন, "আমিও তা'হলে নিঃসঙ্কোচে বল্তে পারি, একজন অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সংস্পর্শে এসে ও রোগটা আমাকেও ধরেছে।" সব কথাগুলি অসীমের কানে স্পষ্ট হ'য়ে আসেনি, আর শরীরের রক্ত-চলাচল হঠাৎ অস্বাভাবিক দ্রুত হ'য়ে উঠেছিল। কোন নারীর মুখ থেকে এমন দ্বিধাহীন কথা শুনবার কল্পনাও তার মনে কোন দিন ছিল না। হঠাৎ সে মিস্ দত্তের একখানা হাত শক্ত মুঠোয় ধ'রে বিস্মিত স্বরে বল্লে, "সত্যি বলছ?" বইখানা টেবিলের উপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মিস্ দত্ত বল্লে, "উঃ — আঙুল থেঁতলে যাবে যে! কি চাষাড়ে হাত তোমার!" — দোরের কিছুটা দূর থেকে মিনু ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "সুমিত্রাদি এখানে?" অসীম তার হাত সরিয়ে নিল। হাত বাড়িয়ে দোর একটু খুলে সুমিত্রা বল্লে, "কি মিনু?" "আসুন, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি।" উত্তরের জন্ত অপেক্ষা না ক'রে মিনু ভিতরে চলে গেল। অসীম আবার সুমিত্রার হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বল্লে, "না, যেতে পারবে না।" সুমিত্রা অসীমের চোখের উপর সস্নেহ দৃষ্টি রেখে বল্লে, "ওঁরা হয়ত কি ভাববেন, মিনু আবার এখানে দেখে গেল।" অসীম তার হাত ছেড়ে দিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সুমিত্রা অসীমের খুলে নেওয়া হাতখানি দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ব'ললে, "রাগ ক'র না, ওঁরা কি ভাববেন তাই বলছি। একটু থেমে আবার বল্লে, "যাবো?" অনুমতি নেওয়ার জন্ত এই সামান্ত একটি শব্দ যেন অসীমকে নতুন অনুভূতিতে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। গলার ভিতর সরলা যেন ডেলা পাকিয়ে উঠতে লাগল। অস্পষ্ট স্বরে ব'ললে, "আচ্ছা যাও," পরক্ষণেই আবার যোগ করে দিল, "বেশী দেরী কর না।" শেষের ছুড়ে দেওয়া কথাটার কোন মূল্য নেই, তবু এই নিরর্থক কথাটার আশ্রয়ে সে হয়ত সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল। তার যেন কান্না পাচ্ছিল। সুমিত্রার চলে যাওয়ার দিকেও চোখ তুলে সে চেয়ে দেখেনি; নিজের চোখের উপর তার বিশ্বাস ছিল না, হয়ত সুমিত্রার মুখেই তা থেকে কোঁটা কোঁটা জল গড়িয়ে পড়ত। পুরুষ হয়েও তার শৌরুষ নেই, দুদিনেই সুমিত্রা নিশ্চয় অনুমানে বুঝে নিয়েছে — সেই অনুমান আরও দৃঢ় হ'ত, অথচ কান্নার কারণ তাকে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হ'ত না।

অনেকক্ষণ সে নিঃশব্দে ব'সে ছিল। বেলা-শেষের অস্পষ্ট আভা দেয়ালের উপর, তার সারা দেহের উপর কিছুকাল থেকে, কখন যে মুছে গিয়ে সন্ধ্যা এসে পড়েছিল, অসীমের সেদিকে খেয়াল ছিল না। খেয়াল হ'ল ওঁদের ফিরে আসার সাড়া পেয়ে। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল।

তারা হল-ঘরের ভিতরে এসে পৌঁছেছিলেন। কতগুলি খণ্ডকথা তার কানে এল, কিন্তু চোখ তুলে সে চাইল না। মামীমা আশা দেবীকে বলছিলেন, "তোরা বৃষ্টি চায়ের চেয়ে কফি ভালবাসিস? — বলনা ওকে, একটা কৌটো নিয়ে আসুক।" মামার উঁচুগলার কথা অসীমের কানে এল — "অসীম, একটা কফির কৌটো নিয়ে এস। — তোমার মামীমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও।" অসীম উত্তর দিলনা, বইর দিকে দৃষ্টি রেখে চুপ করে বসে রইল। মামা একটু রুক্ষকণ্ঠে ডেকে বললেন, "শুনতে পাচ্ছ না? উঠে এস।" চোখ না তুলেই অসীম বললে, "আর কাউকে পাঠিয়ে দিন, আমি এখন পড়ছি।" কিছুকাল হল-ঘর সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইল। মামীমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "নিজের কানে শুনলে ত তোমার আদরের ভাগ্নের কথাটা! আমি যখন বলি দোষ হয়।" আবার আশা দেবীকে বললেন, "দেখলি ত! এই নিয়ে আমায় চলতে হয়।" অতিথিদের সম্মুখে

ঐ উত্তরে তার মামা বোধ করি অপমানে, রাগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারছিলেন না। তিনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "উঠে এসো এখানে! আমার বাড়ীতে থেকে অবাধ্য হওয়া চলবে না।" অসীম ধীরপায়ে বেরিয়ে এল, বললে, "অনেক দিন বাধ্য হয়ে চলেছি, আর ভাল লাগে না।" তার স্বরে কোন ঝাঁঝ নেই, একটু বেশী সংযত শোনাচ্ছিল শুধু। মামীমা তীব্র কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "হ'লত! তোমারই খাবে পরবে, তোমার উপরই চোখ রাঙাবে। আদরের বোনকে এনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে —" অসীম বাধা দিল, "মা খালি হাতে আপনাদের বাড়ীতে আসেননি, আমি জানি, যথেষ্ট গয়না, টাকা নিয়েই এসেছিলেন। কিনি পরবার খাওয়াবার লোক আপনারা নন।" অতিথিদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে, মামীমা উত্তেজিত হয়ে গালাগাল, চিৎকার সুরু ক'রে দিলেন। আশা দেবী বারম্বার বলতে চেষ্টা করছিলেন, "তুমি চুপ কর দিদি, যার ভাগ্নে তিনিই বলুন।" তিনিই বললেন, সবদিক বিবেচনা করেই হয়ত স্পষ্ট ভাষায় ব'ললেন, "গেট্ আউট্। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, গুণ্ডামির জায়গা নয়।" সঙ্গে সঙ্গেই অসীম উত্তর দিল, "এখনি যাচ্ছি।— এতদিন পড়ে থাকা আমারই অন্যায়।" সে তার ঘরে ফিরে এল।

একটি মাত্র স্যুটকেশে তার কাপড়-জামা আর কয়েকখানা বই সে গুছিয়ে নিল। উত্তেজনার ব্যস্ততা তার ছিল না, শুধু স্যুটকেশ্ গোছাবার সময় আঙুলগুলি একটু একটু কাঁপছিল। — হল-ঘরে কেউ ছিলেন না, আলো বন্ধ করে তাঁরা ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। ও আলোটা আর অসীম জ্বালল না, স্যুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে অন্ধকারেই বাইরে যাওয়ার দরজার দিকে সে এগিয়ে গেল। — দ্রুতপায় সুমিত্রা ভিতরে এল। সহজকণ্ঠেই সে ব'ললে, "তুমি বড় অন্যমনস্ক, আমার ঠিকানাই ত নিয়ে গেলে না!" একখণ্ড কাগজ অসীমের হাতে গুঁজে দিয়ে আবার বললে, "পরশুই কলকাতায় ফিরছি।" আর দেরী না ক'রে নিঃশব্দে সে ভিতরে চলে গেল।— অসীম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, সুমিত্রার ঠিকানা জেনে যাওয়ার কথা সত্যই তার মনে ছিল না। সে কলকাতা যাবে, কি আর কোথাও যাবে কিছুই ভাবেনি, কোথাও বেরুতে হবে এই কথাই শুধু তার মনে ছিল। সুমিত্রার ঠিকানা জেনে রাখার কোন প্রয়োজন আছে কিনা সে বুঝতে পারছিল না। অন্ধকারে পড়া না গেলেও কাগজের টুকরোখানা একবার চোখের কাছে তুলে দেখল।— দূরের পেটা-ঘড়িতে সাতটা বাজার শব্দ কানে আসতে, সে ব্যস্ত হ'য়ে দোর খুলে বাইরের উঁচু সিঁড়ির উপর এসে দাঁড়াল। রাস্তা দিয়ে তখন মোটা দুই একা, সাইকেল-রিকসা ছুটে যাচ্ছে, আরও কাছে এক ফেরিওয়ালা হেঁকে চলেছিল, 'মালাই'। কিন্তু, শব্দগুলি কেমন যেন অসীমের কানে স্বাভাবিক শোনাচ্ছে না, সে ভুরু কুঁচকে দূরের রাস্তার দিকে ফিরে তাকাল। গাড়ী-গুলি আড়ালে সরে যেতেই অসীম ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে আসছিল — কিন্তু, অন্ধকারে হঠাৎ পা ফস্‌কে গেল। পড়ে যাবার সময়ে আরেকটা সিঁড়ির কোনে হাঁটুতে ধাক্কা লেগে কিছুটা দূরে সে ছিটকে পড়েছিল — আর কিছু তার মনে নেই, অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হয়ত একবার চিৎকার করে উঠেছিল।

সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসার পর চোখ খুলে দেখলে— নিজের সেই ঘরেই সে শুয়ে আছে। ডান-পা'টা অসাড় মনে হচ্ছে, হাত দিয়ে বুঝতে পারল ওটা প্লাষ্টারিং করা। টেবিলের উপর কতগুলি ওষুধের শিশি, একটা ফিডিং কাপ্। তা'র যেন খুব অস্পষ্ট মনে পড়ছিল—এইঘরে অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ব্যস্ততা, নানা জনের টুক্‌রা কথা। ঘরের

সমস্ত দিকে একবার দেখে নিয়ে, তা'র যেন কেমন সন্দেহ হ'ল, হয়ত অনেকদিন সে এমনি শু'য়ে আছে। কিন্তু, কতদিন তা' কিছুই মনে পড়ে না। — হাতে একবাটি বার্লি নিয়ে হরির মা ভিতরে এল। অসীমের চোখের দিকে চেয়ে সে হেসে বললে, "আজ ত ভালই আছেন দাদাবাবু, চোখ আজ জল্‌ জল্‌ দেখাচ্ছে। — মাগো মা, কি কাণ্ডটাই না হ'ল!" দুর্ব্বলকণ্ঠে অসীম জিজ্ঞাসা ক'রলে "ক'দিন এমন শুয়ে আছি হরির মা?" "ওমা — তা সাত আট দিন ত হবেই। আপনি ত অচৈতন্য, কি ক'রে জানবেন? অরে অরে বেহোঁস্! ডাক্তার বাবু ত পা আজ কাটেন কি কাল কাটেন। যাক্, বাবা তারকনাথ বাঁচিয়েছেন। ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, আর কাটতে হ'বে না, ছমাস-আটমাস পরে উঠে চল্‌তে পারবে। একটু নাকি ল্যাংচাতে হ'বে। তা হোক্ না।" চাপাস্বরে আবার ব'ললে, "দিনরাত কি গজরানি, কি শাপমন্যি, দাদাবাবু! — ঐ আপনার মামীমার।" অসীম দোরের দিকে দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "যাঁরা এসেছিলেন, হরির মা, তাঁরা বোধ হয় এখানে নেই?" "তাঁরা? তাঁরা ত কবেই গিয়েছেন।" বাটি দেখিয়ে বল্‌লে, "খাইয়ে দিয়ে যাবো, না আজ নিজেই পারবেন?" ক্লান্তস্বরে অসীম বল্‌লে, "এখন থাক্।" হরির মা নিশ্চিন্তমনে তার কাজে চলে গেল।

— পায়ের দিকে ঘরের একমাত্র জানালা; অসীমের দৃষ্টি তার ভিতর দিয়ে বাইরে বেরুল। নিস্পন্দ বাজে-পোড়া তালগাছটা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না, কোনদিনই পড়েনি। গাছটার পেছনেই বেহারের রুক্ষ, রঙহীন আকাশ। দৃষ্টি কোথাও আশ্রয় পায় না, বিরাট এক শূন্যতা। অসীমের দৃষ্টি যেন কিছুকাল ঘোরাঘুরি ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে আবার ফিরে এল। চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল, হাত দিয়ে তা মুছে ফেলবার ইচ্ছাও অসীমের ছিল না। সুমিত্রার মুখে সেদিন চোখের জলটা অশোভন হ'ত, আজ আর ভাল-মন্দ কোন মূল্যই তার নেই। — সহসা অসীমের দৃষ্টি আবদ্ধ হ'ল ঘরের কোণে মেজের উপর, সাপের মত আকৃতি নিয়ে একগাছা দড়ি পড়ে ছিল। সে দোরের দিকে ফিরে চাইল — হল-ঘর শূন্য, কেউ কোথাও নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস একটু দ্রুত হ'য়ে উঠছিল। উঁচু জানালাটা একবার দেখে নিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে একটু একটু ক'রে দড়িগাছার দিকে সে এগুতে লাগল। ডান পায়ের জন্য উঠে ব'সতে পারছিল না, কোনরকমে শরীরটা কুঁচকে হাত বাড়িয়ে দিল — জলের গ্লাস হাতে হরির মা এসে পড়্‌ল। আবার পূর্ব্ব অবস্থায় শুয়ে থাকার সময় আর ছিল না, ঐ অবস্থায়ই তাড়াতাড়ি কম্বলটা আগাগোড়া টেনে একটা বালিশ মুখে গুঁজে সে পড়ে রইল। হরির মা অবাক হ'য়ে ব'ললে, "ওকি দাদাবাবু, অমন ক'রে আছেন কেন? কি হ'ল আপনার? ও দাদাবাবু —" অসীমের সমস্ত শরীর ভেঙে কান্না ঠেলে উঠছিল; বালিশে মুখ চেপে রেখেও সে তাকে বন্ধ ক'রতে পারছিল না। কম্বলে-ঢাকা কেঁচোকান শরীরটা বারে-বারে কেঁপে উঠছে। কোন আহত পশুর দুর্ব্বোধ্য আর্ত্তনাদের মতই তার কান্না শোনাচ্ছিল। — হরির মা হয়ত ভয় পেয়েছিল, জলের গ্লাস না রেখেই ঘর থেকে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কিন্তু, হল-ঘর ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার আগে ডাকপিয়নের আওয়াজ তার কানে এল, "চিট্‌ঠী হ্যায়।" এবং পরক্ষণেই খোলা জানালা দিয়ে গ'লে এসে একখানা খামের চিঠি মেজের উপর পড়ল। হরির মা চিঠিখানা হাতে তুলে আবার অসীমের ঘরে ফিরে এল। কিছুকাল দাঁড়িয়ে থেকে সে ডেকে বল্‌লে, "দাদাবাবু, দেখুন ত কার চিঠি!" অসীম কম্বল সরিয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিল।

তারই চিঠি। হাতের অক্ষর অপরিচিত হ'লেও, কে লিখেছে বুঝতে তার সামান্য বিলম্বও হ'ল না। চিঠিখানা বড় নয়, অল্পকয়েক ছত্রে লেখা —

'না আসা সম্ভব ছিল না বলে চলে আস্‌তে হ'য়েছে। কি করে এসেছি তা' আমিই জানি। শুধু এই ভরসা নিয়ে এসেছি ডাক্তার বলেছিল ভয়ের কারণ নেই। সেই ভরসার জোরেই চিঠি লিখতে পারছি। — আমি বাসা ঠিক্ করছি।

কিছুদিন যদি তোমার ঘরে বসেই থাকতে হয়, আমি ছাত্র-ছাত্রী জুটিয়ে আনবো, ব'সে তা'দের পড়াতে পারবে! অনর্থক দুশ্চিন্তা ক'র না, একরকম চলে যাবেই। — মামা, মামীকে তোমার কিছু ব'লতে হ'বে না, আমি গিয়েই ব'লব। তুমি হয় পরিষ্কার ক'রে ব'লতে পারবে না, না হয় ত বেশী ব'লে ব'স্‌বে। — তোমার চিঠি পেয়েই আমি চলে আস্‌বো। লিখো কিন্তু — যে অন্যমনস্ক লোক! আর থাক্। আকাশ-পাতাল ভাবতে ব'স না। আমিও এই দুর্ঘটনাও আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল মেনে নিয়ে ও নিয়ে আর ভাবছি না। তুমিও ভেবো না।

তোমার সুমিত্রা

সমস্ত চিঠিটা একসঙ্গে অসীম প'ড়েনি; খুলেই নাম আর দু'একটা লাইন প্রথমে প'ড়তে পেরেছিল। আগা গোড়া প'ড়তে তার সময় লেগেছে। হরির মা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, অসীমের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে সে ব'ল্‌লে, "আপনার চিঠি দাদাবাবু?" প্রশ্নটা অবশ্য বাহুল্য। অসীম চিঠি আরেকবার প'ড়তে আরম্ভ ক'রে বল্‌লে, "হাঁ।" জলের গ্লাস টেবিলের উপর রেখে হরির মা চ'লে যাচ্ছিল, অসীম তাড়াতাড়ি ডেকে ব'ল্‌লে, "একজন নাপিত দেখলে পাঠিয়ে দিও ত। — ক'দিন কামানো হয়নি, কি বিশ্রী দেখাচ্ছে।" ডান হাত দিয়ে আস্তে-আস্তে মুখে সে হাত বুলাতে লাগ্‌ল।

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন, সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।
সেই শত সহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কী কারণে।

আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ আমন্ত্রণে, হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধ ফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ। সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে।

— রবীন্দ্রনাথ

শ্রুতি-স্মৃতি

প্রত্যেক জাতির শ্রুতি-স্মৃতি আছে; জাতির প্রতিভা ও মনীষা — জ্ঞান ও প্রেম — ইহার স্রষ্টা। এই শ্রুতি-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হয়, এবং শ্রবণ ও মননের দ্বারা জীবন্ত রাখিতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের সেই মানস-জীবনের বহুকালাগত ধারা ছিন্ন হইয়াছে, এমন কি, গতযুগের মনীষিগণের অমূল্য চিন্তারাজিও সাহিত্য হইতে প্রায় নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই বিভাগে আমরা সেইগুলিকে যথাসাধ্য পুনর্জ্জীবিত করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের চিত্তগোচর করিব।

বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

জীবতত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে, ইয়োরোপীয় এবং এশিয়াবাসীতে, খৃষ্টান শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোতে জাতি বিচার করা হয়, তেমন উৎকট জাতি-বিচার কোন কালে ও যুগে এশিয়ার কোন দেশে ও জাতির মধ্যে ছিল না, এখনও নাই। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, বর্ণগত ও বীজগত জাতি-বিচার বৌদ্ধগণ উঠাইয়া দিয়াছিলেন; মুসলমানগণ সে সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ উদারতা দেখাইয়া সকল বর্ণ ও সকল জাতির সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ যুগের পরে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ও জাতির মধ্যে যে জাতি-বিচার ও বিভাগ প্রচলিত হইয়াছে এবং এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, সে জাতি-বিচার বর্ণগত বা বীজগত নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় এবং বৃত্তিগত। উহাকে স্যর হর্বার্ট রীজলী "প্রফেশন কাষ্টস্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কামার, কুমার, ছুতার, চামার, তিয়র, জালুক, মালো প্রভৃতি সকল জাতি-বিভাগই ব্যবসায়গত। উহা বৈদিক চারি বর্ণের হিসাবে জাতির হিসাব নহে। কেবল শিল্পী জাতির কথা বলি কেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এক স্বতন্ত্র জাতি। ব্রাহ্মণ জাতি আবার ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত; সে বিভাগও ব্যবসায়গত, যেমন মালাকার এবং দেবল ব্রাহ্মণ, মিঠুইকর ব্রাহ্মণ, নট ব্রাহ্মণ, নর্ত্তক ব্রাহ্মণ, পটুয়া ব্রাহ্মণ, শীতলার ব্রাহ্মণ, শল্য ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মধ্বজী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। লেখক ও করণ বেদু কায়স্থ এক স্বতন্ত্র জাতি; চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিয়া বৈদ্য এক স্বতন্ত্র জাতি। বলা বাহুল্য আধুনিক জাতি-বিচার সবটাই ব্যবসায়গত বৈষম্যের উপর বিন্যস্ত। আবার মজা এই, বাঙ্গালার এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মধ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছে।

কুম্ভকার কালুক হইয়াছে, কামার ছুতার হইয়াছে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য সমাজে স্থান পাইয়াছে, এমন কি বৈদ্য ও কায়স্থ গুরুগিরি করিতে করিতে ব্রাহ্মণজাতিভুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় যে কত রকমের ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইলে, অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত পুরুষ বিস্ময়ে অবাক্ হইবেন। এই বর্ণ ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব বাবাজীও হইয়াছেন, অনেকে কায়স্থ সমাজে স্থান পাইয়াছেন, অনেকে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত, অনেকে চণ্ডাল সমাজে আশ্রয় পাইয়াছেন। এক ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস অপূর্ব্ব। ব্রাহ্মণ বলিলে যে Priestly caste বুঝিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ নরপতিগণ সৈনিক কর্ম্মকারী বাস্তিক ব্রাহ্মণগণকে খেলো করিবার উদ্দেশ্যে অনেক রকমের বিশিষ্ট কর্ম্মী মানুষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন।

আরও একটা মজার তথ্য প্রকাশ করিব। মধু কাণের সুর ও গান বাঙ্গালায় খুব প্রসিদ্ধ। "কাণ" শব্দ কিন্নর শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনেক পণ্ডিত বলেন। প্রকৃত পক্ষে "কাণ" শব্দ কাহ্ন শব্দের অপভ্রংশ। কাহ্ন বা কাণ্হু পণ্ডিত একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন; তিনি গায়ক, গীত রচয়িতা এবং নর্ত্তক ছিলেন। জাতিতে তিনি বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ "শ্রমণ পণ্ডিত" বা বৌদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই সম্প্রদায়ভুক্ত বা বংশধরগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজেদের জাতি-পরিচয় দিবার সময়ে বলিতেন, আমরা কাণবামুন। এই কাণ জাতি এখন লোপ পাইয়াছে, অর্থাৎ বিশাল সমাজ-অঙ্গে অন্য জাতির আবরণে আত্মগোপন করিয়াছে। ইহাদের মহিলা সকল কীর্ত্তন করিতেন, তাহারা কেহই বেশ্যা বা বারমুখী ছিলেন না। বাঙ্গালার শতবর্ষ পূর্ব্বকার বড় বড় কীর্ত্তনীয়া নারী কাণ বা গাধ্ জাতীয়া ছিলেন। স্বয়ং কবি জয়দেব, মনে হয়, কাণ জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নীসহ স্বরচিত "গীত গোবিন্দ" পদাবলী নাচিয়া-নাচিয়া গান করিয়া বেড়াইতেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, যাজ্ঞিক ও কুলীন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক নাচিয়া গান করিয়া বেড়াইতে পারেন না। এমন কর্ম্ম করিলে পাতিত্য ঘটে, অর্থাৎ স্বসম্প্রদায় হইতে পতিত বা চ্যুত হইয়া তাহাকে অন্য সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইতে হয়। জয়দেবের পাণ্ডিত্যের কথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই; কেঁদুলীতে তাঁহাকে অনেকে কিন্নর-ব্রাহ্মণ বা কাণ বলিত। কাহ্নুর রচিত অনেক দোঁহা ও গানে স্বজন বলিয়া জয়দেবের উল্লেখ আছে। যাউক সে কথা; ঘরের মেয়েরা, কন্যা, ভগিনী, পত্নী প্রভৃতি নাচ-গান করিত বলিয়া জাতির পরিচয় দিতে অধুনা অনেকের সঙ্কোচ বোধ হয়; তাই ইংরেজী সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে অনেক 'কাণ' ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, এই তিন জাতির মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে। অনেকে "জাতি-বৈষ্ণব" হইয়াছে। গাঁধ জাতিও এই পদ্ধতি অনুসারে রাঢ়দেশে অন্য জাতির সামিল হইয়াছে। গাঁধ্ বা গন্ধর্ব্ব-জাতি, অথবা "গন্ধা" সিদ্ধাচার্য্যের বংশধর ও সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি-সকল কাণেদের মতন আত্মগোপন করিয়াছে। এমন যে কত রকমের মেলা-মেশা বাঙ্গালার জাতি সকলের মধ্যে হইয়াছে, তাহার এখন হিসাব রাখা চলে না। কুলজী গ্রন্থে এক জাতি হইতে অপর জাতির মধ্যে প্রবেশের দৃষ্টান্ত অনেক আছে; আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অমন দুই একটা জাতান্তর গ্রহণের উদাহরণ স্মরণ রাখি। সেকালের সমাজপতিগণ দম্ভের বশে এক জাতীয় পুরুষকে নিম্নতর শ্রেণীতে নামাইয়া দিতেন। নাম-ধাম ধরিয়া কার কথা ত বলিবার উপায় নাই, অমনি মানহানি ও নালিশ। কেন না ইংরেজদের আমলে Respectabilityর আবরণে যত গোঁড়ামি বাড়িয়াছে, এত গোঁড়ামী কোন কালে, কোন যুগে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। সে ঘটকের দল নাই, সে বিশাল বিরাট কুলজী পুঁথি সকল নাই। বাঙ্গালার প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তির বংশের

ইতিহাস কুলজী-গ্রন্থে নিবদ্ধ ছিল ; ভাল, মন্দ, উন্নত, অবনত সকলের সকল কথা কুলজী ঘাঁটিলেই জানা যাইত। ফাঙ্কন-কৌলীন্যের প্রভাবে ইংরেজ-আমলে অহংকারের ও মাৎসর্য্যের কৃষ্ণ-যবনিকার অন্তরালে সভ্য আত্মগোপন করিয়াছে। অতীতের অবগুণ্ঠন এখন কেহই উন্মোচন করিতে চাহে না। কাজেই সংক্ষারণভাবে অনেক কথা কহিতে হয়। বলিতে হয়, বাঙ্গালার ব্যবসায়গত জাতি ছাড়া অন্য জাতি ছিল না — নাইও। বলিতে হয়, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল না, এখনও নাই। বলিতে হয়, আধুনিক বাঙ্গালী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মেলনে উদ্ভূত। এই সম্মেলন-বার্ত্তা সকল করিয়া শিবায়ন-গ্রন্থে কবি লিখিয়া গিয়াছেন। শিবের কুচুনী-পাড়ায় গমাগমি, রঙ্গপুরের রঙ্গ ত আর কিছুই নহে, বাশিষ্ঠ পদ্ধতি অনুসারে শৈব-বিবাহ প্রচলনের ইঙ্গিত। শিবই যখন এমন কর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলেন, তখন অন্যে পরে কা-কথা। যদি পরে কখনও শিবায়ন প্রমুখ শিব-সম্পর্কীয় মহাকাব্য সকলের আলোচনা করিবার অবসর পাই, তাহা হইলে তখন এক একটি বাঙ্গালা শ্লোক তুলিয়া আমার তাবৎ সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে পারিব। এখন এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও বচন সংগ্রহ করিয়া তবে এই সন্দর্ভ সকল লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(৩)

বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, ইহারা কেহই খাঁটি বাঙালী নহে। ইহারা কান্যকুব্জ হইতে আমদানী-করা মানুষ। একটা নূতন কথা বলিব। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগের পরে, পুনঃ ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার কালে দশবিধ ব্রাহ্মণ মান্য ও গ্রাহ্য হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চ গৌড় এবং দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে — গৌড়, উৎকল, মৈথিল, সারস্বত এবং কান্যকুব্জ, এই পঞ্চ শ্রেণী মান্য। গৌড় ব্রাহ্মণই খাঁটি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ; অথচ এখন বাঙ্গালা দেশে একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবে না। রাজপুতানায় পঞ্জাবে, মন্ত্রীরাজ্যে ঘড়ওয়ালে এখনও অনেক গৌড় ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ এবং ডোগরা ব্রাহ্মণ গৌড় ব্রাহ্মণদের বংশধর। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পরে মগধে এবং গৌড়ে অর্থাৎ বাঙ্গালার গৌড় ব্রাহ্মণদের উপর উৎপাত-উপদ্রব হয়। সেই সময়ে গৌড় ব্রাহ্মণ সকল দলে দলে বঙ্গ ও মগধ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। একদল উত্তরাখণ্ডের পার্ব্বত্য পথ অনুসরণ করিয়া নেপালে, মন্ত্রীরাজ্যে, টিহিরীতে যাইয়া বাস করে; তাহাদের অনেকে পরে ঘড়ওয়াল ও রোহিলখণ্ডে নামিয়া বসবাস করে। আর এক দল গঙ্গার তট ধরিয়া পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া যায়। বৌদ্ধপ্রভাব যেমন যেমন পশ্চিম ভারতবর্ষে এবং আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল, উহারাও তেমনি হটিয়া যাইতে লাগিল। শেষে রাজপুতানার মরুপ্রদেশে এবং পঞ্জাবের উত্তরাংশে এবং কাশ্মীরে যাইয়া উহারা আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজপুতানার সকল রাজ্যে এখনও গৌড় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রহিয়াছে। গৌড় ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধার্থের ধর্ম্মমতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। উহাদের অনেকে জীনাচার বা জৈন মত মান্য করিতেন। জৈন মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিত এখনও প্রায় গৌড় ব্রাহ্মণ। জৈন মুনিও অনেকে গৌড় ব্রাহ্মণ। ওই গৌড়ের ব্রাহ্মণের Trek বা দেশান্তর-গমন-বার্ত্তা পুরাণে স্কন্দ উপাখ্যানের আবরণে বেশ মজা করিয়া বলা আছে।

এই সঙ্গে আরও একটা মজার কথা শুনাইয়া রাখিতে হইবে। বৈশ্য বা শ্রেষ্ঠীদিগের মধ্যে তিনটি শ্রেণী প্রধান ছিল ; যথা — গৌড়ী, মাগধী এবং

মাথুরী। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের সহিত গৌড়ী শ্রেষ্ঠি বৈশ্যের দলও বৌদ্ধের উপদ্রবে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়। গৌড়ী শ্রেষ্ঠি তমোলুকের ব্যাপার-বাণিজ্য পরিচালন করিত; তাহারাই আমদানী-রপ্তানির কাজের গোড়া বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই শ্রেষ্ঠির দল প্রধানতঃ জৈনাচারী বা জৈনধর্মাবলম্বী ছিল। গৌড়ী শ্রেষ্ঠির দল দেশ ত্যাগ করিয়া প্রধানতঃ রাজপুতানা ও গুর্জর দেশে বাস করে। এখন বড়বাজারে (কলকাতায়) যে সকল মাড়বাড়ী ও ভাটিয়া বণিক আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে, ইহাদের প্রায় চৌদ্দ আনা অংশ গৌড়ী অথবা মাগধী বৈশ্য, — পক্ষ গৌড়ের আদিম অধিবাসী, পুরাতন বাঙ্গালী।

তাই মারবাড়ী ও ভাটিয়াদিগকে বিদেশীয় বলিয়া একবার খবরের কাগজে ব্যঙ্গ করাতে, মারবাড়ের একজন পণ্ডিত আসিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, — "অন্যে যাহা বলে বলুক, তুমি ত রাজবাড়ার সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছ, সিদ্ধচারণদের গাথা শুনিয়া আসিয়াছ, আমাদের পুঁথি-পত্র পড়িয়া আসিয়াছ, তুমি এতবড় কথাটা কেন বলিলে? আমরা গৌড় ব্রাহ্মণ ও গৌড়ী ও মাগধী শ্রেষ্ঠীর দল, আমরাই তো বাঙ্গালার আদিম নিবাসী। বাঙ্গালা আমাদের, আমরাই আসল বাঙ্গালী। তোমরা ত' কোনোজীয়া—ব্রহ্মাবর্ত্তের অধিবাসী, হিন্দু রাজার আনুকূল্যে তোমরা এদেশে মোট হাজার বৎসর কাল বাস করিতেছ।

কথাটা খুব সত্য। আদিশূরের সময়ে আসিয়া থাকি বা তাহার পূর্ব্বে বা পরে দলে দলে আসিয়া থাকি, আমরা এদেশের আদিম অধিবাসী নহি। বাঙ্গালাদেশে বৈদিক আচার প্রবল রাখিবার উদ্দেশ্যে, আর্য্যভাবে বাঙ্গালী জাতিকে মণ্ডিত রাখিবার চেষ্টায়, মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আমদানী করিতে হইয়াছিল বাঙ্গালার 'আর্য্যামি'র চাষ প্রবল রাখিবার বাসনায় এই আমদানী হয়। আমরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, — আমরা প্রধানতঃ কনৌজিয়া। বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য, তাহারা প্রধানতঃ মৈথিল বা অযোধ্যার সরযূপারী ব্রাহ্মণ; যাহারা দাক্ষিণাত্য শ্রেণীভুক্ত তাহারা প্রধানতঃ উৎকল বা আন্ধ্র ব্রাহ্মণ। প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কনৌজিয়া ও পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বঙ্গদেশে বাস করিলেও, এদেশের কোন ব্রাহ্মণের সহিত সাধারণভাবে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতেন না। অনেকে কান্যকুব্জ হইতে বিবাহ করিয়া পত্নীসহ বাঙ্গালায় আসিতেন, কেহ কেহ বাঙ্গালার প্রবাসী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ করিতেন। মোগল-পাঠানের সংগ্রামের সময়ে, শেরশাহের শাসনকাল পর্য্যন্ত, উত্তর ভারতে ঘোর অশান্তি বিরাজ করে। তখন আর কথায় কথায় কাহারও কনৌজে যাওয়া চলিত না। সেই সময়ে, আকবরের শাসন-কালের সূচনা পর্য্যন্ত, বাঙ্গালায় কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে একটা বিষম সামাজিক গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। দেবীবর সেই গণ্ডগোলের সমাধান করেন। তাঁহার মেলবন্ধন ও কৌলিন্যপ্রথার প্রচলন আর কিছুই নহে, উহা বাঙ্গালার পুরাতন ব্রাহ্মণ এবং করণ জাতি সকলের সহিত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বৈবাহিক সম্বন্ধনের নামান্তর মাত্র। কেবল ইহাই নহে, প্রথম পাঠান অভিযানের পরে, নীলচক্ষু-গৌরবর্ণ সুন্দর ও সুরূপ কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ-জাতির অনেক কন্যা পাঠানগণ হরণ করেন। তখন কনৌজিয়াদিগের মধ্যে নারীর অভাব অতিমাত্রায় হইয়াছিল, তাই অনেক পাঠানী-অপহৃতা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ কন্যাকে ছিনাইয়া আবার ঘরে আনা হয়। এই হেতু জাতির মধ্যে এক-একটা 'দোষ' ঘটে। যথা যবন দোষ, কৈসরখানি দোষ, রোহেলা দোষ, চাঁদাই দোষ, ইত্যাকার ছাব্বিশ রকমের দোষের

সমাধান দেবীবর করিয়াছিলেন। বিলাতী সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে এখনকার বিজ্ঞান-সঙ্গত ভাষায় যাহাকে Canterisation, insulation, absorption এবং Transmagnification বলা হয়, তাহার সকল-গুলির সমন্বয়, ব্যাখ্যা এবং সমাধান দেবীবর করিয়া-ছিলেন। দেবীবরের তুল্য সমাজ-সংস্কারক ইদানীং আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ অনেক জিনিষ আত্মসাৎ করিয়াছিল। পাঠানীর গর্ভজাত পুত্র-কন্যা ব্রাহ্মণ-সমাজে চলিয়া গিয়াছিল। এমন absorption বা একাত্মীকরণের পদ্ধতি দেবীবরের পরে আর কেহ দেশে চালাইতে পারেন নাই। দেবীবরের 'মেলবন্ধন', 'মেলমালা' প্রভৃতি কুলজী গ্রন্থসকল ভাল করিয়া অভিনিবেশসহ পাঠ করিলে বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্বের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ পাইবে। তাঁহার মেল-বন্ধন, পালটি, ও প্রকৃতিনির্দ্দেশ ব্রাহ্মণসমাজের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সাধন করে। একদমে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সৃষ্টিনের বংশধরেরা পনেরো লক্ষে পরিণত হয়। কুলজী গ্রন্থরাশিতে অনেক বাজে ও মেকি মাল আছে বটে; পরন্তু উহার বাছাই করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, বিভাগ-বিচার করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিলে, এমন সকল অপূর্ব্ব রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে, যাহার প্রভাবে আমরা বাঙ্গালার তথা সমগ্র উত্তর ভারতের সকল প্রদেশের জাতি-তত্ত্ব ও বিস্তৃত এবং উপেক্ষিত লৌকিক ইতিহাস ঠিকমত জানিতে ও বুঝিতে পারিব।

এই সঙ্গে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের উল্লেখও একটু করিতে হয়। বৌদ্ধ একাকারের পরে পাঠান উপদ্রবগত একাকার হয়। সেই নানা জাতির এবং নানা শোণিতের সম্পিণ্ডিত সমাজকে হিন্দুত্বের আবরণ দিবার উদ্দেশ্যে, উহাকে পুরামাত্রায় Nationalise করিবার চেষ্টায়, বাঙ্গালার তিন ব্রাহ্মণ তিন দিক হইতে তিন রকমের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম, — মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে সমাজের সকল দোষ দূর করিতে চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় — দেবীবর, সমাজের সংস্কার করিয়া, মেল-খাক্, জাতি-কুলের নির্দ্দেশ করিয়া, বৈবাহিক আদান-প্রদানের পদ্ধতি স্থির করিয়া, সামাজিক শুদ্ধিসাধনের চেষ্টা করেন। তৃতীয় — স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন, হিন্দুর typical evolution বা বাষ্টিগত আদর্শের উন্মেষ-চেষ্টায় আচার-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন। প্রথম দুইজন social cohesion বা সামাজিক ও জাতিগত সংহতিশক্তির উন্মেষসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। রঘুনন্দন, আকারগত, ব্যবহারগত, আচারগত আদর্শের সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি আচার-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-ধর্ম্ম লইয়া সবিস্তার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালায় দুই জাতি আছে — ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। শূদ্রের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, (১) সৎ শূদ্র বা ব্রাহ্মণ-আচারঅনুকারী, (২) সাধারণ শূদ্র; ইহাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ-আচার অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা না করিবে, পুরাতন বৌদ্ধ আচার ধরিয়া থাকিবে, কেবল তাহারাই জল-অনাচরনীয় হইবে। ব্রাহ্মণের যে সকল বৃত্তিগত সম্প্রদায় বা "প্রফেশন কাষ্ট" আছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে পারিবে, শূদ্রদিগের যে সকল "প্রফেশন কাষ্টস্" আছে, তাহারাও নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে পারিবে; এমন বিবাহ বৈধ বা স্মৃতিশাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। ইহাই রঘুনন্দনের বড় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হওয়াতে, পুরাতন বজ্রযানী বা মহাযানী বৌদ্ধ এবং নবীন হিন্দুর মধ্যে সমন্বয়-সাধন হওয়াতে বাঙ্গালায় এককালে চারি কোটি হিন্দু হইয়াছিল।

Social cohesiveness সাধনের এমন প্রশস্ত উপায় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার ইহা একটা বড় উপাদান।

বাঙ্গালীর জাতিসত্ত প্রকৃত পরিচয় লইতে হইলে যে কত বিষয়ের আন্দোলন-আলোচনা করিতে হইবে, কেমন scientific পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও, কত বিষয়ের বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত এই সম্বন্ধে করিয়া রাখিলাম। বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন-সমাজের এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না বলিয়া, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্ম-পরিচয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়া, আমি এই প্রকারের প্রবন্ধ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি। জানি না, আমার চেষ্টা সার্থক হইবে কি না। ইংরেজী-শিক্ষিত সুধী-সমাজ অনুসন্ধিৎসু হইয়া বাঙ্গালার অতীত ও বর্ত্তমান জাতি ও কুল-পরিচয় গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন কি না, তাহাও বলিতে পারি না। তবে, আমার জীবনব্যাপী পরিশ্রমে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই কিছু কিছু বিদ্বান্ত পাঠকগণের গোচর করিবার প্রয়াসে এই সকল সন্দর্ভ আমাকে লিখিতে হইতেছে।

বাসনা-বিহগ

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

মনের কোটরে সন্ধ্যা ঘনায়
অন্ধকারেতে ঢাকা —
বাসনা-বিহগ, থামাও তোমার
থামাও অধীর পাখা।

* * *

কত জনহীন মরুপ্রান্তর
হ'য়ে এলে তুমি পার,
কত তুষারের জমাট সাগরে
নব নব অভিসার,
কত বেদনার দেয়ালী জ্বলিছে
চিররাত্রির দেশে —
কত তারকার গোলকধাঁধায়
পথ হারায়েছ শেষে!

* * *

আকাশে তো তুমি পাও নাই তব
জীবনের সন্ধান,
উষার মত শুধু উঠেছিলে
উল্লাসে ভরা প্রাণ।
কলিমলসার বনে বনে তুমি
ফেরনি অন্ধসম
স্বার্থের কাঁটা জাগায় যেখানে
বেদনা তিক্ততম।

* * *

বাতাস ছাপায়ে ভেসে আসে তব
ধূসর পাখার ধ্বনি,
সাগরের পারে ব'সে ব'সে আমি
বেদনার ঢেউ গণি।

* *

সমুখে রজনী, তারি পদধ্বনি
শুনিতে কি তুমি পাও?
আঁধারে ভরেছে নীরব ধরনী
দেখিছ না তবু তা-ও!
আকাশের বুকে নিমের বেদনা
তারার আখরে আঁকা —
বাসনা-বিহগ, এবার থামাও
থামাও তোমার পাখা॥

শেষ পাঠ

আলফঁস দোদে

হামেল মাষ্টার পড়া দিয়াছেন — পার্টিসিপল। এক অক্ষরও পড়ি নাই ; শাস্তি খাইবার ভয়ে বুক দুরু দুরু করিতেছে, তাহার উপর আবার বেলা করিয়া স্কুলে রওনা হইয়াছি। একবার লোভ হইল আফিকার মত স্কুল পালাই, আর সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াই। দিনটা এমন পরিষ্কার, জলের ধারে পাখী কিচিমিচি করিতেছে, কাঠের গোলার পিছনে খোলা ময়দানে প্রুসিয়ান সৈন্যরা কুচ-কাওয়াজ করিতেছে। পার্টিসিপল-এর পড়ার চেয়ে কুচকাওয়াজ দেখা ঢের ভাল। — কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভ সম্বরণ করিলাম — স্কুলে গেলাম।

টাউনহলের পাশ দিয়া যাইতে দেখিলাম নোটিশ বোর্ডের সামনে বহু লোক ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, থামিলাম না। ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম, দুই বৎসর যাবৎ আমাদের পক্ষে যত খারাপ সংবাদ — এই নোটিশ বোর্ড হইতেই আমরা পাইয়াছি, — যুদ্ধে হারার সংবাদ, বিজেতা সেনাপতির নিত্য নূতন হুকুম ; ভাবিতে লাগিলাম — এ বেলা আবার নূতন কী ঘটিল ?

টাউন হল ছাড়াইয়া শন শন করিয়া চলিয়াছি। ওয়াচার কামার আর উহার ছোকরা নবীশ, বোধ হয় নোটিশ পড়িতেছিল, পিছন হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিল —

"এত হন হন করে ছুটো না খোকা, যথেষ্ট সময় পাবে স্কুলে যাবার।"

থামিলাম না, ভাবিলাম লোকটা আমার সঙ্গে তামাসা করিতেছে। হামেল মাষ্টারের বাগানের সামনে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন দম প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে।

বুল আরম্ভ হইলে দূরে রাস্তা হইতে তাহার গোরগোল শোনা যায় — ডেস্ক বেঞ্চির খটাখট, টেবিলের উপর মাষ্টারের রুলার চাপড়ানো, দুই কানে আঙুল চাপিয়া সকলে মিলিয়া গলা ফাটাইয়া পাঠ আবৃত্তি। কিন্তু আজ সব ঠাণ্ডা কেন ? ভাবিয়াছিলাম গোরগোলের সুযোগে সুরুৎ করিয়া বেঞ্চিতে নিজের জায়গায় গিয়া বসিয়া পড়িব, দেরীতে আসা কেহ টের পাইবে না। কিন্তু আজ রবিবারের মত সব ঠাণ্ডা। জানালা দিয়া দেখিলাম, সহপাঠীরা বাঁধা বাঁধা জায়গায় বসিয়া আছে, আর প্রচণ্ড লোহার রুলারটা বগলে লইয়া হামেল মাষ্টার বেঞ্চির সারের মধ্য দিয়া পায়চারী করিতেছেন। দরজা ধাক্কা দিয়া সকলের চোখের সম্মুখ দিয়া ক্লাশে ঢুকিতে হইল। সঙ্কোচে ও ভয়ে যেন কাঠ হইয়া গেলাম।

কিন্তু কিছুই ঘটিল না। আমার দিকে তাকাইয়া হামেল খুব নরমভাবে বলিলেন, "এই যে ফ্রাঙ্ক, তাড়াতাড়ি তোমার জায়গায় গিয়ে বোসো। তোমাকে ছাড়াই ক্লাশ সুরু হচ্ছিল।"

বেঞ্চির উপর দিয়া লাফাইয়া নিজের জায়গায় বসিলাম। ভয়টা যখন একটু কাটিল — তখন মাষ্টার মহাশয়ের জমকালো পোষাকটা নজরে আসিল — সবুজ কোট, কোঁচানো সার্ট, সিল্কের কাজ-করা কালো টুপি ; ইন্‌স্পেক্টর আসিবার কিংবা পুরস্কার-বিতরণের দিনের পোষাক। সমস্ত স্কুলটাও কেমন গুরুগম্ভীর হইয়া গিয়াছে মনে হইল। সবচেয়ে বিস্ময় বোধ হইল পিছনের বেঞ্চাগুলির দিকে তাকাইয়া। ঐ দিকটায় কেহ কখনও বসে না ; কিন্তু আজ দেখিলাম আমাদের গ্রামের যত বুড়া ছাত্র সাজিয়া

আমাদের-ই মত চুপচাপ হইয়া সে দিকটায় বসিয়া আছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব মেয়র, স্তেফানা টুপিপরা হাউজার, আসেকার পোষ্টমাষ্টার, আরও কয়েকজন। প্রত্যেকেরই মুখ দুঃখে কালো, হাউজার বসিয়া আছে হাঁটুর উপর একখানা পুরানো, মলাট প্রথম ভাগ খুলিয়া, চাপিয়া ধরিয়া। উহার উপর তাহার খোলা চশমা।

ব্যাপার কি ভাবিতেছি, হামেল তাহার চেয়ারের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। যে মৃদুগম্ভীর স্বরে আমাকে বসিতে বলিয়াছিলেন, তেমনই কহিলেন —

"বালকগণ, আজ তোমাদের আমি শেষ-পড়া পড়াব। বার্লিন থেকে হুকুম এসেছে — আলসেস আর লোরেটন দেশে জর্ম্মান ছাড়া পড়ানো চলবেনা। কাল তোমাদের নতুন মাষ্টার আসবেন, আজ তোমাদের শেষ ফরাসী-পাঠ, তাই আজ খুব মনোযোগ দিয়ো।"

কথাগুলি বজ্রাঘাতের মত মনে হইল। হায়রে, এই সংবাদই লিখিয়াছে টাউন-হলের বোর্ডে।

আমার শেষ ফরাসী-পাঠ। আমি এখনো সুন্দর করিয়া লেখা পর্য্যন্ত শিখিয়া উঠি নাই। আমাকে আর শিখিতে দেওয়া হইবে না। এইখানে, এই মুহূর্ত্তে লেখা বন্ধ করিতে হইবে। এতদিন পড়া না শিখিয়া, পাখীর ডিম চুরি করিয়া বেড়াইয়াছি — দুঃখে মন ভরিয়া গেল। কিছুক্ষণ আগেও বই-গুলি আপদ মনে হইয়াছিল, বোঝার মত ভারী ঠেকিয়াছিল। কিন্তু এখন অকস্মাৎ মনে হইল, আমার ব্যাকরণ, আমার "সাধুচরিত-কাহিনী" — ইহারা আমার একদণ্ডও ছাড়িয়া থাকা যায়না এমন বন্ধু। আর হামেল মাষ্টার! হামেল মাষ্টার চলিয়া যাইবেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না — একথা ভাবিতে গিয়া — তাঁহার ফ্রক্‌কোট, তাঁহার মেজাজ সব ভুলিয়া গেলাম।

শেষ-পাঠের সম্মানে হামেল মাষ্টার আজ সুন্দর পোষাক পরিয়াছেন। বুঝিলাম গ্রামের বুড়োরাই বা কেন ক্লাশে আসিয়া পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া আছে! অতীত জীবনে আরো ভালো করিয়া পড়া না শিখিবার দুঃখ তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছে। চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হামেল মাষ্টার গ্রামের শিক্ষা-গুরু, তাহারা বিদায়ী গুরুকে শেষ-পাঠ-শ্রবণ দক্ষিণা দিতে আসিয়াছে, যে দেশ আর তাহাদের নয়, সে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছে।

এ সব কথা ভাবিতেছি — এমন সময় হামেল মাষ্টার আমার নাম উচ্চারণ করিলেন; পার্টিসিপল-এর পাঠ এখন আমার মুখস্ত বলিবার পালা। নির্ভুল এবং পরিষ্কার উচ্চারণে সবটুকু পাঠ বলিয়া যাইবার ক্ষমতা যদি কোন দেবতা এই মুহূর্ত্তে আমাকে দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি সর্ব্বস্ব পণ করিতাম। কিন্তু প্রথম শব্দ উচ্চারণেই বিদ্যা ফুরাইয়া আমি ঠেকিয়া গেলাম — সব গোলমাল হইয়া গেল। বুক ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল, মুখ তুলিয়া চাহিতে সাহস হইল না; দুই হাতে শক্ত করিয়া ডেস্ক ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শুনিলাম — হামেল আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।—

"ছোট্টো ফ্রাঁজ, তোমাকে আমি বকবো না, জানি এমনিতেই তোমার খুব খারাপ লাগছে। এখন স্থাখো, পাঠ-লেখার সময় রোজ আমরা খালি বলি — আজ থাক। ঢের সময় আছে, কাল শিখব। এখন স্থাখো — কোথায় এসে আমরা আটকে গেলাম। — আঃ — এই আমাদের আলসেস-বাসীদের দোষ — সময় মত কিছুই শিখব না। ঐ যে বাইরের বিদেশীগুলো এসেছে, ওরা তো এখন বলবেই — 'কী আশ্চর্য্য! তোমরা বলছ তোমরা ফরাসী, কই, নিজেদের ভাষাতো তোমরা লিখতে বা পড়তে কিছুই জানো না' — তোমার আর কী দোষ ফ্রাঁজ, — আমাদের সকলেরই অনেক পাপ।

"তোমাদের বাপ মা-রা চান না যে তোমরা বড়ো লেখা-পড়া শেখ। তাঁরা বরং চান, তোমরা কাজে-কর্মে ভর্তি হয়ে তাড়াতাড়ি দুটো পয়সা ঘরে নিয়ে এসো। আর আমি? আমারও পাপের সীমা নেই। যখন তোমাদের পড়ার সময়, তখন কি আমার ফুল গাছে জল দিতে আমি তোমাদের পাঠাইনি? আর যেদিন আমার মাছ-ধরার সখ হয়েছে, সেদিন কি কোন অছুহাতে আমি তোমাদের ছুটি দিয়ে দিই নি?"

কথা হইতে কথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া হ্যামেল অবশেষে ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন — পৃথিবীর মধ্যে ফরাসী ভাষা সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সোজা; ইহার ব্যাকরণ সবচেয়ে যুক্তি-যুক্ত। বলিলেন — এমন যে ভাষা ইহা যেন কোন ক্রমেই না ভুলি, যেন ইহাকে আমাদের স্মৃতিতে গোপনে জিয়াইয়া রাখি। কারণ, একটা জাতি যখন দাস হইয়া যায় তখন—যতক্ষণ সে তাহার ভাষাকে আঁকড়াইয়া থাকিবে, ততক্ষণ সে তার নিজের কারা-গারের চাবীটিই আঁকড়াইয়া থাকিবে। তারপর হ্যামেল ব্যাকরণ খুলিলেন এবং সেদিনকার পাঠ আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন। অবাক হইয়া গেলাম — জলের মত সব বুঝিতে পারিতেছি; যাহাই হ্যামেল মাষ্টার বলিতেছেন তাহাই মনে হয় এত সহজ! বোধ হয়, ইহার আগে কখনও এত মনোযোগ দিয়া পাঠ শুনি নাই এবং এত ধীর ভাবে হ্যামেলও কখনও পাঠ বুঝাইয়া দেন নাই। মনে হইল আমাদিগকে যাহা কিছু দিবার — যাইবার আগে তাহার সবটুকু আমাদিগকে দিয়া যাইতে চাহেন এবং তাহা এক মুহূর্তের মধ্যে।

ব্যাকরণের পরে হাতের লেখার পালা আসিল। প্রত্যেকের ডেস্কের সঙ্গে একটি করিয়া শিক লাগান আছে। তাহাতে হাতের লেখার কপি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। হ্যামেল আজ সব ভেঙে ভেঙে নূতন কপি ঝুলাইয়া দিলেন। তাহাতে অতি সুন্দর হাতে গোল-গোল করিয়া লেখা "ফ্রান্স, আলসেস, ফ্রান্স"; স্কুল-ঘরের সর্বত্র ছোট ছোট নিশানের মত কপি-গুলি ঝুলিতে লাগিল। টুঁ-শব্দটি না করিয়া সরল ছাত্র হাতের লেখা সুরু করিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু কাগজের উপর কলমের খসখস আওয়াজ শোনা যায়। স্কুল-ঘরের ছাদে অতি মৃদুস্বরে পায়রা ডাকিতেছে। মনে মনে বলিলাম, "আচ্ছা, এই পায়রাগুলোকেও কি ওরা জর্মান ডাক শেখাবে?"

লেখা হইতে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া দেখিতে-ছিলাম — হ্যামেল নিশ্চল হইয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন আর ক্লাশ-ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষের দিকে এক এক করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছেন। চল্লিশ বৎসর ঐ একই জায়গায়, একই ভাবে — জানালার বাহিরে বাগান ও চোখের সামনে ক্লাশ লইয়া — তিনি বসিয়া কাটাইয়াছেন। শুধু ডেস্ক ও বেঞ্চিগুলি মসৃণ হইয়া হইয়া মোলায়েম হইয়াছে, বাদামগাছ-গুলি উঁচু হইয়াছে, জানালা ও ছাদ বাহিয়া আঙ্গুরের লতা বাড়িয়াছে। বৃদ্ধ হ্যামেল! অনুমান করিলাম, সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার মন কেমন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। উপর তলায় তাঁহার বোন চলাফেরা করিতেছিলেন এবং বাক্স-প্যাটরা বন্ধ করিতেছিলেন। সেই আওয়াজ নিশ্চয় তাঁহার কানে আসিতেছিল। পরদিন তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু সমস্ত পাঠ শেষ করার আগে ভাঙ্গিয়া না পড়ার শক্তি হ্যামেলের ছিল। হাতের লেখার পরে আসিল ইতিহাস, তারপর শিশু-ছাত্ররা সমস্বরে সুরু করিল — বা,বে,বি,বো,বু। চশমা চোখে লাগাইয়া, দুই হাতে প্রথম ভাগ ধরিয়া বুড়া হাউজার তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। হাউজার সত্যই পাঠ শিখিতেছে, আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে, এই কৌতুক দেখিয়া আমার হাসি পাইল — কান্নাও পাইল।

অকস্মাৎ গির্জ্জা-ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া উঠিল। প্রুসিয়ানরা কুচ-কাওয়াজ করিয়া ফিরিতেছিল। ঠিক সেই ক্ষণে আমাদের জানালার নীচে তাহাদের বাজনা বাজিয়া উঠিল। চেয়ার ছাড়িয়া হ্যামেল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চেহারা বিবর্ণ, কিন্তু মনে হইল আজ তাহাকে অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশী লম্বা দেখাইতেছে।

"বন্ধুগণ" — হ্যামেল কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমি ..... আমি ....." তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল. আর বলিতে পারিলেন না।

এক টুকরা চক লইয়া ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এবং থরথরভাবে বড় বড় করিয়া লিখিলেন —

"ফ্রান্স অমর হোক!"

তারপর থামিয়া দেয়ালে মাথা হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শুধু হাত দিয়া ইঙ্গিত করিলেন, — "তোমাদের স্কুল শেষ হয়ে গেল, তোমরা এখন যেতে পার।"

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্ — সমস্ত বাঙালীর প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালীর এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র?

... দেশের মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে?

... একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা-সাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল, — তখন তার ক্ষুদ্রতাকে, তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সজীব, ছোট হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালীর ইংরেজি-চর্চাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের কোনো পরিচয়, কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না — আমাদের মত অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়। বাহিরের সেই সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতী বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে, কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে।

— রবীন্দ্রনাথ

মণি-মঞ্জুষা

এই বিভাগে মাসে মাসে উৎকৃষ্ট কবিতা চয়ন করিয়া খাঁটি কাব্যরস বিতরণ করা হইবে—যে-রস সর্ব্বকালের রসিকসমাজ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং যাহা বাঙালী-জীবনের এবং বাংলাভাষার কাব্যরসও বটে। একালের অনেকে আধুনিক (অতি-আধুনিক নয়) বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামও জানেন না, নাম জানিলেও তাঁহাদের কবিতার সহিত অনেকের সত্যকার পরিচয় নাই। 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে আমরা সেই সকল কবির উৎকৃষ্ট কবিতা পড়াইব। উপস্থিত তাঁহারা কবিতাই পাঠ করুন—কবিদের নামে প্রয়োজন নাই; পরে বর্ষ-সূচিতে নামের উল্লেখ থাকিবে।

(১)

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউয়ে গমনে।
নিত্যগামী রথ-চক্র নীরবে ঘুরিল,
আবার আয়ুর পথে। চলন্ত-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল,
হায় রে, ক'ব তা' কা'রে, ক'ব তা' কেমনে!

কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!
বাড়িতে লাগিল বেলা; ডুবিবে সত্বরে
তিমির জীবনরবি। আসিছে রজনী,—
নাহি যা'র মুখে কথা বাদুড়-রূপ স্বরে;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি;

চিরুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা,—তপনের ভূতী, অরুণ-রমণী!

তুমি কে ! তুমিই কি গো নব-যাচকের
নববর্ষ ! আশা-বীণ অকূল-পাথারে !
এস হে মঙ্গলবাহু হাহার আগারে, —
বান্ধবহীনের বন্ধু ! আইস সত্বর !
বলির কুসুমরাশি এ মরু-উপর ;
নিবাও এ ধূ ধূ চিতা শান্তির আসারে ;
খেলাও মলিন ওষ্ঠে হাসির লহর ;
জাগাও শোণিত সুপ্ত ধমনী-মাঝারে !

যা হবার হয়ে গেছে, ভুলিয়া কাহিনী
আগেকার, — বিশ্বাসিব মোরাও তোমারে !
তুমি যেন হে সুন্দর ! কুৎসিত আচারে
দিও না আননে তব কলঙ্ক-লেপনি ।
নিতি নিতি নব বেশে হাসে উষা সতী, —
রহিও চির-তরুণ তুমিও তেমতি !

তোমার নামে মোরাই মাথা তুলে অনাথ !
অনির্বচনীয় !
প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ !
প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও
প্রাণে আমার প্রিয়,
আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধ্যান !
সন্দেহী সে ভাব্‌ছে — তোমার অব্যাহত
কল্যাণেরি ধারা
বন্ধুরতায় বিকল নরলোক,
চর্মচোখের আর্শী হতে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝরে পারা,
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে ।
বীভৎস দুঃস্বপ্ন ভরে বিশ্বজনের উঠ্‌ছে বুক কেঁপে,
হাসছে যেন ভৈরবী-ভৈরবে ;
ভয়ের মেঘে ঝাপসা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্য্যেরে
রয় চেপে,
সে ভয় প্রভু ! হরো 'মা ভৈঃ'-রবে ।

প্রীতি-শীতল এই পৃথিবী প্রেত-লীলা হয় যাদের উপদ্রবে,
রুদ্র-রূপে তাদের করো নত ;
দম্ভাসুরের দম্ভ কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—
মাটির তলে পাঠাও কীটের মত ।
• • •
আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোক-পাতে
প্রাণ করে প্রার্থনা —
ওগো প্রভু ! ওগো জগৎ-স্বামী ! —
প্রণব-গানে নিখিল-প্রাণে নবীন যুগের হর প্রবর্তনা,
জ্যোতির রূপে চিত্তে এসো নামি' ।
সকল প্রাণে জাগুক রাজা ; যাক্ রাজাদের
রাজাগিরির নেশা ;
জগৎ জয়ের যাক্ খেয়ে তাওব,
ঘুচাও হে দেব ! নিঃশেষে এই মানুষ জাতির
মানুষ-পেষণ পেশা,
চিরতরে হোক্ সে অসম্ভব ।

দেশ-বিদেশে শুনছি কেবল রোজ রাজাসন পড়ছে
খালি হয়ে,
সে-সব আসন দখল কর তুমি,
মালিক! তোমার রাজধানী হোক সকল মুলুক
এ বিশ্বনিলয়ে,
সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্যভূমি।

তোমার নামে মুইয়ে মাথা, অভয় দাতা! দাঁড়াক
জগৎ-প্রভা
ঋজু হয়ে তোমার আশীর্ব্বাদে।
তোমার যারা নকল রাজা! তাদের সাজা আসছে
নেমে সোজা
যুগান্তেরি ভীষণ বজ্রনাদে।

অমঙ্গলের ভুরুগ-ফণায় মঙ্গলেরি জ্বলছে মহামণি
কয় মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা,
বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বলছে
মুকুল গণি' —
কমল-বনে আসছে নবীন দিবা!

(৪)

এসো তুমি এসো নূতন অতিথি!
উদার রতন প্রদীপ জ্বালি';
রৌদ্র এখনো হয় নি অসহ
এখনো ওঠেনি পথের বালি!
মধু যামিনীর যোতিহার ছিঁড়ে
ছড়ায়ে পড়েছে মহুয়া ফুল,
তোতার তুণ্ডিয়া রঙের নেশায়
বনভূমি আজ কি মশগুল!
রেশমী সবুজে সাজে দেবদারু
পনসী সবুজে রসাল সাজে,
আবৃত হয়ার কিশোর পরুষ
সবুজের মখ্‌মলের মাঝে।
কত ফুল আজি পড়িছে ঝরিয়া, —
পড়ুক ঝরিয়া নাহিক ক্ষতি;
হালকা হাওয়ার দিন সে ফুরাল,
উদিল জীবনে গুরুর জ্যোতি।

বসন্ত আজ মাগে অবসর
যৌবন-শোভা পড়িছে ঝরি';
চির-নবীনের ওগো নবদূত!
তোমারে আজিকে বরণ করি।
এস গো মৌন! মর্ত্ত্য-ভুবনে
নীরব চরণে এস গো চলে,
তন্দ্রা-তরল স্বচ্ছ আঁধার
উঠিছে দুলিয়া হাওয়ার দোলে।
ওগো পুরনারী, ভরি' হেমঝারি
চন্দন-বারি ঢালো গো ঢালো;
শিরীষ ফুলের পেলব কেশর
আকাশে বিছায় উদার আলো।
এস গো নূতন! রাঙার বরন
এস আলোকের চতুর্দ্দোলে;
অশোকের ফুলে বুলে মধুকর
আমের কুঞ্জে কোকিল ডোলে।

আদি প্রভাতের প্রথম প্রভা
　　পরাণে আবার মিলাও আসি',
ভুলায়ে দাও গো শোচন রোদন
　　পুরাণোর 'পরে পর্দা টানি'।
বাসি স্বপনের কজ্জল-রেখা
　　হয়তো নয়নে রয়েছে লাগি';
তাম্বূলরাগ রয়েছে অধরে
　　সে ত্রুটির ক্ষমা নীরবে মাগি।
মঙ্গলারতি করিছে পাখীরা
　　চামেলি বরিষে লাজাঞ্জলি,
পুণ্যাহ! ফিরে এসো গো জীবনে
　　প্রভায় ভুবন সমুজ্জলি'।

উঁচু সুরে বেঁধে তুলেছি সেতার
　　বাজাও তাহারে যেমন খুশী,
দীপকে, বাহারে, মেঘে, মল্লারে, —
　　কখনো হাসিয়া, কখনো রুষি'।
চন্দন-লেখা দ্বারে দ্বারে আজি
　　বন্দন-মালা দুলিছে বারে,
পেয়ারা ফুলের রেশমী মিঠাই
　　ছড়ায়ে পড়িছে দখিনে-বারে।
উৎসব-সুরে বাঁশি বাজে পুরে
　　অতিথি আলয়ে এস হে তবে,
সাক্ষী দেবতা, তোমায় আমায়
　　সপ্তপদীর অধিক হবে।

রৌদ্র তখন রহিবে না মৃদু,
　　তাতিয়া উঠিবে পথের বালি,
তবু এস তুমি, অজানা পথিক!
　　আশার রতন প্রদীপ জ্বালি'।

---

(৫)

এস বর্ষ।
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আমি, দুর্ব্বল হৃদয়,
তোমার এ আগমনে,　　সুখ না হইল মনে,
সতত শঙ্কিত আছি কিসে যে কি হয়!
বঞ্চনায় নিত্য নিত্য　　বিশ্বাস করেনা চিত্ত,
চূণে গেছে মুখ তেতে দধি দেখে ভয়!
বদিহে কুশলে রাখ,　　বদি শুভ এনে থাক,
দিব ধন্যবাদ তোমা যাবার সময়!

---

(৬)

নবীন বরষ, তোমার কাছে নবীন জীবন যাচি,
আঘাত করেও বাঁচাও, মোরা মরার কাছাকাছি।
এক হাতে ঐ চক্র রাজে, অন্যে অভয়-শঙ্খ বাজে,
মধুক্ষরণ করছে তোমার আলার মালাগাছি।

কিসলয়ের কম্প্র বুকে আশার বাণী আনো,
ঝরা পাতার পাহাড় চূড়ায় বস্ত্র তোমার হানো।
শুষ্ক লতা শুষ্ক শূপে জীবন যোগাও চুপে চুপে,
মেঘ-মৌচাক নিঙড়ে ছড়াও উড়িয়ে মৌ-মাছি।

তড়িৎ-কেতু উড়িয়ে তোমার আসছে ঝড়ের রথ,
বজ্রে মাদল বাজছে, ধূলায় পূর্ণ তোমার পথ।
মোদের পীড়ক বৈরী যারা দৈবভরে মরুক তারা,
মাভৈঃ মাভৈঃ শুনে মোরা তাথৈ তাথৈ নাচি।

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তদর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
সে ত' নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তব নব-বৎসরের আশীর্ব্বাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া আমরা লক্ষ্য করি (১) কতকগুলি চিত্রাত্মক। কেবল রসচিত্র অঙ্কন ছাড়া সেগুলিতে অন্য উদ্দেশ্য নাই।

(২) কতকগুলি কাব্যাত্মক — হয় গদ্যাকারে অর্থাৎ গদ্যাকারে কবিতা — নয়ত সমস্ত গল্পের মধ্যে একটা গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হইতেছে। (৩) কতকগুলি রোমান্স্ মাত্র অথবা বাস্তবরূপের রোমান্সে পরিণতি (৪) কতকগুলি সমস্যামূলক। (৫) কতকগুলি তথ্যমূলক — দুই একটি নীতিমূলক গল্পও আছে।' 'আষাঢ়ে গল্প' ও 'অতিপুরাতন গল্প' রূপক। 'জয়-পরাজয়' অর্দ্ধরূপক।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি তিনভঙ্গীতে লিখিত। একটি প্রথমপুরুষীয় ভঙ্গী — সাধারণতঃ এই ভঙ্গীতেই অধিকাংশ গল্প লেখা হয়। দ্বিতীয়, মধ্যমপুরুষীয় ভঙ্গী — কেবল 'স্ত্রীর পত্র' এই ভঙ্গীতে লিখিত। তৃতীয়, উত্তম পুরুষীয় ভঙ্গী — ইহাই auto-biographical ভঙ্গী। এই ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গল্প বিরচিত। এই ভঙ্গীতে লিখিত গল্পগুলির একটি বিশেষত্ব এই — বক্তা তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া জীবনের ভুলভ্রান্তি সমস্তই স্বীকার করিতেছে, অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ করিতেছে এবং হৃদয়ের নিভৃত বেদনার অভিব্যক্তি দান করিতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্ষেপ, নির্ব্বেদ বা অনুতাপের দ্বারা তাহার বক্তব্য অভিরঞ্জিত। ফলে, সমস্ত গল্পটায় বক্তার হৃদয়ের বেদনার সুর একটা লিরিক সুরের মত ধ্বনিত হইয়াছে। সেজন্য রচনারীতি একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

'কর্ম্মফল' গল্পটি নাটকীয় ভঙ্গীতে (Inter-locutory form) এবং 'শেষের রাত্রি' অর্দ্ধনাটকীয় ভঙ্গীতে লিখিত।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক উচ্চজাতীয় হিন্দুসংসার বা হিন্দুর পারিবারিক জীবন লইয়া গল্প রচনা করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু পরিবার লইয়া তাঁহার একটী গল্প আছে—সেটির নাম 'শাস্তি'। 'পণরক্ষা' গল্পটি উচ্চ শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী সমাজের।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত হিন্দু গৃহস্থের সংসার হইতে একটু দূরে দূরেই ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির বলে তিনি হিন্দুসংসারের মোটামুটি খবর রাখিতেন। তাই তিনি বর্ণনার ও আবেষ্টনী-রচনার যথাযথতা যত দূর সম্ভব রক্ষা করিয়াছেন — সর্ব্বত্রই যে যথাযথ হইয়াছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব ছিল ত বটেই, তাহা ছাড়া কাঁটায় কাঁটায় যথাযথতা রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে তাহা তিনি মনে করিতেন না। সকল সময়ই লক্ষ্য করিতেন — আসল কথাটা বলা হইতেছে কিনা।

বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা গল্প লেখেন তাঁহারা চিত্রের এবং চরিত্রের উপাদান উপকরণে যথাযথতা রক্ষায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিকতর অবহিত। মুখের কথাও যাহাতে ঠিক ঠিক চরিত্রের মুখেরই উপযোগী হয় — সেদিকেও তাঁহারা সতর্ক। কারণ, বর্ত্তমান পাঠকের চিত্ত আগেকার চেয়ে অনেক বেশী জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী, সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। মিথ্যাটা ছদ্মবেশ ধরিয়া যত সত্যের মত মনে হয় — ইহারা তাহাতে তত আনন্দ লাভ করে। অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের কথাশিল্পিকে খুব realistic

হইতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এতটা Realistic হইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল জীবনসত্তা ও সমস্তার দিকে, প্রতি ছিল গীতি-কবিতার সুরের দিকে।

কবি যেখানে অভিজাত-পরিবারের বা জমিদার সংসারের কথা লইয়া গল্প রচনা করিয়াছেন — সেখানে স্বতঃই তাহা Realistic হইয়া পড়িয়াছে — কবির নিজের অভিজ্ঞতা সেখানে কোথাও ফাঁক রাখে নাই। কেরানী, মাষ্টার ও উকিলের চরিত্রের বাস্তবরূপ ততটা ফুটে নাই, যতটা ফুটিয়াছে নায়েব গোমস্তার চরিত্রের রূপ।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ধনী পরিবারের চিত্র যতটা উজ্জ্বল হইয়াছে, দরিদ্র পরিবারের চিত্র ততটা উজ্জ্বল হয় নাই। দরিদ্র পরিবারকে যতদূর সম্ভব তিনি বর্জন করিয়াছেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে যে পঙ্কিলতা, কদর্যতা, হিংসা, লোলুপতা ইত্যাদি জড়িত আছে — সে সকলকে কবি তাঁহার স্বাভাবিক শুচিবোধ, শুচিতা ও আভিজাত্যবোধের প্রণোদনায় পরিহার করিয়াছেন, পাপের গভীরতম পঙ্কে তাঁহার কল্পনা অবতরণ করিতে জুগুপ্সা বোধ করিয়াছে। রসের জন্য যে মানবচরিত্রের রসাতলে নামিতে হইবে, তাঁহার কল্পদৃষ্টি তাহা স্বীকার করিত না। এসমস্ত তিনি প্রধান শিষ্য শরৎচন্দ্রের জন্য এবং প্রশিষ্যদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় কবির ঘনিষ্টই ছিল। গল্পগুলিতে পল্লীপ্রকৃতি যতটা চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে — পল্লীজীবনটা ততটা স্পষ্টভাবে ফুটে নাই। খুব অল্পসংখ্যক গল্প পল্লীতেই পরিসমাপ্ত। পল্লীতে আরম্ভ হইয়া বহু গল্প নগরে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অনেক সময় নাগরিক জীবনের ভূমিকাস্বরূপই পল্লীজীবন আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক গল্পে পল্লী ও নগরের মধ্যে যোগসাধন রচিত হইয়াছে।

জীবধর্ম ও দেহধর্মের চাহিদার (Biological and Physiological demand) উপরে সাহিত্যের রাজা, — রবীন্দ্রনাথের ইহাই অভিমত। সাহিত্যের, বিশেষতঃ ছোটগল্পের, উপাদাননির্বাচনেও তিনি নরনারীর যে সুখ দুঃখের সঙ্গে ঐ চাহিদার সম্বন্ধ নাই কিংবা সম্বন্ধ খুব কম, সেই শ্রেণীর সুখদুঃখের কথাই ভাবিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার গল্পে যেমন কামলীলার স্থান হয় নাই — তেমনি অন্নাভাবের দুঃখেরও স্থান হয় নাই। ছোট গল্পগুলিতে দরিদ্রসংসারের নিত্য নৈমিত্তিক অভাব অনটনের কথা নাই বলিলেই হয়। দারিদ্র্যের বেদনাকে গল্পের উপজীব্য হিসাবে অবলম্বনের ভার তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য শরৎ-চন্দ্রের হাতেই অর্পণ করিয়াছিলেন। তারপর দরিদ্র জীবনের কথাই বর্তমান যুগে কথা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে।

মুসলমান সমাজের কথা কবির ছোটগল্পে নাই বলিলেই হয়। 'সমস্যাপূরণে' একটি মুসলমান বিধবা ও তাহার পুত্রের কথা আছে। 'দুরাশা' গল্পে একটি মুসলমান যুবতীর কথা আছে — উহা রোমান্সসৃষ্টির জন্য। আর 'কাবুলিওয়ালা'র রহমান অভারতীয় মুসলমান।

'অধ্যাপক' গল্প ছাড়া অন্য ব্রাহ্ম সমাজের কথাও নাই। ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের কথা আছে 'কর্মফলে'। হিন্দুসমাজের অন্ধ কুসংস্কার ও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কৃত্রিম বিজাতীয় জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা অনেক স্থলে ফুটিয়াছে। সমাজের উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জীবনের স্বার্থপরতা, শঠতা, ভণ্ডামি, কপটতা, অর্থলুব্ধতা ইত্যাদিকে অনাবৃত করিয়া ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে বহু গল্পে। শ্বেতাঙ্গ-ভক্তিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। একাধিক বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের কথা দুই একস্থলে আছে। বাল্য বিবাহের কথাই আছে বহুস্থলে — সেগুলিতে বাল্য বিবাহের কুফলই সাধারণতঃ দেখানো হইয়াছে।

প্রণয়ের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিলে দেখা

যায় — রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে দাম্পত্য প্রণয়ের কথাই বেশি। দাম্পত্য প্রণয়ের ব্যাপারে দ্বিতীয়া নারীর আবির্ভাব ঘটাইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি, তাহা বঙ্কিমের উপন্যাসে খুবই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে সে সমস্যা নাই বলিলেই হয়। মধ্যবর্তিনীতে একটি নারীর অবতারণা করা হইয়াছে — তাহাও বিবাহিতা পত্নী।

রবীন্দ্রনাথ যে সময় এই গল্পগুলি লেখেন তখন হিন্দুসমাজে এত শিক্ষিতা মহিলার আবির্ভাব হয় নাই — যুবতী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েরা অবিবাহিতা থাকিত না। সেজন্য কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালবিবাহের ও উত্তররাগের কথাই লিখিয়াছেন। হৈমন্তীর বিবাহ হইয়াছিল ১৩।১৭ বৎসর বয়সে — তাই লইয়া শ্বশুরবাড়ীতে কত আলোচনা! কত বাঙ্গবিদ্রূপ যুবতী না হইলে প্রাক্-বৈবাহিক প্রণয় দেখানো যায় না — সেজন্য রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রাক্-বৈবাহিক প্রণয়ের বিশেষ স্থান নাই — প্রণয়ের অঙ্কুরিত রূপটি বালিকার প্রসঙ্গ তুলিয়াই দেখানো হইয়াছে। 'না-মঞ্জুর' গল্পে ও 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পে যুবতী অবিবাহিতা নারীর, 'প্রতিবেশিনী' গল্পে বিধবা যুবতীর প্রণয়ের উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে — প্রণয়ের উন্মেষ বা লীলাবৈচিত্র্যের কোন বিবৃতি নাই। 'কঙ্কালে' একটি বিধবা নারীর প্রণয়ের কথা বলা হইয়াছে — কিন্তু প্রণয়ীর পক্ষ হইতে কোন সাড়ার ইঙ্গিতও দেওয়া হয় নাই। এক 'মহামায়া'র পরিণত বয়স্কা অবিবাহিতা নারীর প্রণয়ের কথা আছে, কিন্তু তাহাকে অবিবাহিতা কুলীনকন্যা করা হইয়াছে। সেকালে অনেক কুলীনকন্যা কুলীন পাত্রের অভাবে, বিশেষ করিয়া পিতার অর্থের অভাবে, মাতুলালয়ে অবিবাহিতা থাকিত।

কবির নিজের জবানী কথাগুলিতে — বিশেষতঃ নিজের অনুভূতির উচ্ছ্বাসে — যতই মুখরতা থাকুক — পাত্রপাত্রীরা বেশী কথা বলে না। মিতভাষণ ছোট গল্পগুলির জবানির একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। সেখানে অনুভূতি এত গভীর যে বাক্যে প্রকাশ হয় না — সেখানে কবি বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মৃত্যুর সম্মুখে বহু নাটকে আমরা নায়কের মুখে বক্তৃতা শুনি। সে টেকনিক রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে নাই। 'উদ্ধার' গল্পে গুরু ডাকিলেন "গৌরী"। গৌরী কহিল — "আসিতেছি, গুরুদেব।" তারপরই গৌরীর দেহ বিশ্বের ক্রিয়ায় চলিয়া পড়িল। 'শাস্তি' গল্পে — ডাক্তার কহিল — "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়। তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব?" চন্দরা বলিল "মরণ —"

ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীর মুখের বাণী 'প্রতিহিংসার' ইন্দ্রাণীর মত। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী কথাসাহিত্যে এই মিতভাষণের মর্য্যাদা রাখেন নাই। পরবর্ত্তী কথাসাহিত্যে রস অপেক্ষা তত্ত্ব প্রবল হইয়াছে, পাত্রপাত্রীও বাদানুবাদে প্রমত্ত — তাহাদের মুখে আত্মমতসমর্থনের জন্য যুক্তির আতিশয্য।

গল্প-গুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বক্রোক্তির পরিমিত প্রয়োগে রচনাশৈলী লঘুগতি ও লাবণ্যময়ী। বক্রোক্তিগুলি যেন হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। কবির কথায় — "ঢেউএর মুখে মোতির ঝিনুক যেন মরু বালুর তীরে।" পরবর্ত্তী কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলী বক্রোক্তির ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বকার সেই লঘুসঞ্চার সে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই শৈলীর অমিত ভাষণ যেন শেষের কবিতার 'অমিত রায়ের' বাঙ্ময় রূপ।

প্রথম যুগের গল্পগুলিতে পাত্রপাত্রীর মুখের কথা পর্য্যন্ত সমস্তটাই মার্জ্জিত বাংলার রচিত — মাঝামাঝি সময়ের গল্পগুলিতে পাত্রপাত্রীর মুখের কথাগুলিই কেবল চল্‌তি ভাষায় রচিত — শেষের দিকে গল্পগুলি আগাগোড়া সমস্তই চল্‌তি ভাষায় লিখিত। কবি ক্রমেই যে চল্‌তি ভাষার মূল্য

মর্ম্মবাণী বুঝিতেছিলেন তাহার পরিবর্ত্তনধারা ছোট গল্পের মধ্য দিয়াই বুঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের উপসংহারগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কোন কোন গল্পের উপসংহৃতি হইয়াছে — গীতিকবিতার সুরে। কোন কোন গল্পের গঠনটা বাস্তবধর্ম্মোপেত, কিন্তু উপসংহার হইয়াছে একটা রোমান্সে — কোন কোনটির উপসংহার হইয়াছে একটি কোন তথ্যের ইঙ্গিতে। এইগুলি ছোট গল্পের নিজস্ব টেকনিক নয়। পাঠকের কৌতূহলকে গল্পের শেষ পর্য্যন্ত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে টানিয়া লইয়া গিয়া, শেষে একটি চরম কথা বলিয়া অথবা একটি অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত চমকের সৃষ্টি করিয়া বিস্ময়ানন্দের সঞ্চার করা, ইহাই ছোট গল্পের নিজস্ব টেকনিক। অধিকাংশ গল্পে গল্পের নিজস্ব টেকনিকই অবলম্বিত হইয়াছে।

গৃহত্যাগ বা দেহত্যাগের দ্বারাও অনেক গল্পের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। গৃহত্যাগ বা দেহত্যাগ কোন না কোন অন্যায় বা অবিচার, অসত্যের প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ইহাতে একটা চমকের সৃষ্টি হয় নাই বটে — কিন্তু তাহাতে আমাদের ন্যায়বুদ্ধির একটা পরিতৃপ্তি হয়, তাহা রসবোধকে সহায়তাই করে। ভ্রান্তি ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও অনেক গল্প উপসংহৃত।

ছোট-গল্প হইলে ইহা সেই ঘটনা-মণ্ডল বা প্লট আশ্রয় করিতে পারিত না, যাহা নহিলে জীবনের কোন একটা দিক সম্পূর্ণ আকারে দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোট গল্পে তাহা আবশ্যক হয় না, তাহাতে জীবনের তেমন করিয়া দেখিবার, দেখাইবার অভিপ্রায় নাই; সে যেন ক্যামেরার ক্ষুদ্র প্রেক্ষণ-পরিধির মধ্যে যেটুকু চকিতে দেখিয়া লওয়া যায় তাহারই একটা চিত্র; সে চিত্রকে বিশালতর পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার পারিপার্শ্বিকের বিস্তার, বা খণ্ড-আকার হইতেই তাহার মণ্ডলাকার আমরাই কল্পনায় পূর্ণ করিয়া লই — তাহাই তাহার রস।

— মোহিতলাল

গ্রন্থ-পরিক্রমা

স্মরগরল—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

আজিকার এই গদ্যকবিতার যুগে, — যে যুগে কবিতার মধ্যে রূপ বা রস কোনটিরই প্রায় সন্ধান পাওয়া যায় না — যে যুগে কবিতা বস্তুত দিকভ্রান্ত আর ভণ্ড ও ধূর্তের সম্মোহনে বা মতবাদের ভারে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই যুগে মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা লিখিতে বসিয়াছি। দুঃসাহসের কাজ বটে! কিন্তু কেন এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হইলাম সে সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কৈফিয়ৎ দীর্ঘ হইবে না।

রূপ এবং রসের যুগ্ম সমন্বয়ে যে কবিতার জন্ম, সে কবিতা হয় কালজয়ী। মোহিতলালের কবিতা শুধুই রূপসুন্দর নহে, শুধু শব্দের আড়ম্বর বা দীপ্তিই নহে, — তাঁহার কবিতার অন্তরালে কল্পনার ও রসের যেমন একটি অন্তর্গূঢ়তা আছে, তেমনি উদ্বেলতাও আছে। কি শব্দসন্নিবেশে, কি অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনায় কি গাঢ় ও গূঢ় রসসমৃদ্ধিতে — তাঁহার সমকক্ষ কবি আজকালকার বাংলা সাহিত্যে বিরল। মোহিতলালের কবিতায় রূপ এবং ভাব, — এ দুইয়ে পার্বতী-পরমেশ্বরের মত নিত্যসম্পৃক্ত থাকিয়া তাহার কাব্যকে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বর্তমানের গদ্য-কবিতায় এ দুইটির কোনটিরই বালাই নাই। আজকালকার কবিতার শরীর ঢঙটা আছে, কিন্তু ছটা নাই। সে শব্দাড়ম্বর কানে একটা চমক লাগায় বটে, কিন্তু অন্তরকে তাহা স্পর্শ করে না। বস্তুনিষ্ঠ কবিতা আজকাল কৈ রচনা হইতেছে! অনেকেই এই শ্রেণীর গদ্য কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন, পড়িয়া ভাবে গদগদ হন এবং সেই সকল কবিতা 'ভাল হইয়াছে', বা 'ভাল লাগিয়াছে', এমন কথা বলিয়াও থাকেন। নতুবা যে অতি আধুনিক মনোবৃত্তি বা সৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বলিয়া সমাজে তাঁহাদের পরিচয়টা হইয়া উঠে না। অথবা, সাহিত্য-সভার রসিক সাহিত্যিক বলিয়া সভাপতির বরমাল্যটা

তাঁহাদের ছুটে না! মান বাঁচাইবার জন্য এবং 'আপ-টু-ডেট্' বলিয়া পরিচিতি লাভের জন্যও এই নূতন ছাঁদের কবিতা তাঁহাদের যে ভাল লাগা চাই।

মোহিতলাল, করুণানিধান, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ত দূরের কথা, রবীন্দ্রনাথকে ভাল লাগে এমন কথা বলিলেও কোন কোন মহলে আজ পুরাতন-পন্থী পাঠক বলিয়া নিন্দিত হইতে হয়। কারণ বাংলা কবিতার নবজন্ম, নবরূপায়ণ নাকি রবীন্দ্রোত্তর কালে অতি-আধুনিক গদ্য-কবিতা রচয়িতাদের হাতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথে নাকি এ যুগের দৃষ্টিভঙ্গি নাই, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের কবিদের মধ্যেও নাই। তাহা আছে কি না সে বিচার প্রবৃত্তি হইব না, শুধু এইটুকু এখানে বলা যে তাঁহাদের মধ্যে কাব্যরস আছে, কাব্যের মধ্যে যে সম্পদ থাকিলে তাহা চিরন্তন হয়, তাহা আছে। সেজন্যই তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিবেন। কাব্যরসপিপাসুদিগের চিত্তবিনোদন এই সকল কবির কাব্য চিরদিন ধরিয়া করিবে। তত্ত্বরসিক বা মতবাদ অন্বেষণকারীদের কথা আলাদা।

তবে ভরসা করি, বাংলায় এখনও কাব্যরসপিপাসু পাঠক আছেন, রবীন্দ্রকাব্যানুরাগী পাঠক আছেন। অন্ততঃ বাংলার, তথা ভারতের সর্বত্র বাঙ্গালীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব, রবীন্দ্র-তিরোধানের উৎসবপালনের সমারোহ দেখিয়া তাহাই ত মনে হয়! তাঁহাদের কাছে মোহিতলালের কবিতা ভাল লাগিবে।

ভাল লাগিবে বলিতে ভরসা পাইবার আরও একটা কারণ আছে। মোহিতলালের 'স্বরগরল' কাব্যখানির দ্বিতীয় সংস্করণ কিছুকাল হইল প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলাদেশে কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া একটু বিচিত্র আর বিস্ময়কর বৈ কি! বিশেষতঃ এই গদ্য-কবিতার যুগে, মোহিতলালের কাব্যের যখন দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, তখন মনে হইতেছে যে, বাংলায় এখনও ছন্দ-মিলযুক্ত কবিতার পাঠক লোপ পান নাই। তাঁহাদের জন্য এই সমালোচনার অবতারণা। চেষ্টা করিয়া গদ্য কবিতার মধ্যে দিয়া বাঙ্গালীকে আজ যে রসের রসিক করিয়া তুলিবার উদ্যম জাগিয়াছে, তাহা যে একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রাণধর্ম অনুসারী ছন্দমিলযুক্ত কবিতা বঙ্গসাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে—তাহার যেন আশ্বাস এবং আভাস মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে। সেই আশ্বাসে আশান্বিত হইয়া 'স্বরগরল' কাব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগে মোহিতলালের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ও পূর্ণপরিণতি ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত যে কয়জন কবি রবীন্দ্রপ্রভাবকে এড়াইয়া নিজেদের কল্পনা অথবা বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে মৌলিকতা বা স্বকীয়তা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মোহিতলাল অন্যতম। তবু যে যে কারণে মোহিতলালের কাব্যরস — শুধু মোহিতলালের কেন, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বাংলার কবিদিগের কাব্যরস আস্বাদন এখনও লোকে ব্যাপকভাবে করে নাই, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী, নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাই প্রধান বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ প্রতিভার তীব্র জ্যোতিতে তাঁহার সমসাময়িক কবিদিগের প্রতিভা ঢাকা না পড়িলেও, তাহা যে ম্লান হইয়া গিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মোহিতলাল ইঁহাদের একজন। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অন্যান্য প্রায় সকল কবির মত তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শুধু প্রতিধ্বনি নাই, একটা প্রাণের সাড়া, জীবনের সৃষ্টি এবং অভিনব কল্পনার সুস্পষ্ট আভাস আছে। ধরণীর রূপ রস বর্ণ গন্ধ আলো উপভোগ করিবার এবং নারীসৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার ও তাহা উপভোগ করিবার প্রণালী — এই কবির মত ও

পথ, রবীন্দ্রনাথ হইতে যে কত পৃথক তাহা তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি অনুশীলন করিলেই চোখে পড়ে। রূপ ও প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের ধারণা খুবই স্পষ্ট। আলোচনার মধ্য দিয়া উভয় কবির মধ্যে বৈষম্য দেখাইবার চেষ্টা করিব।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম। মৌলিক কল্পনা, শব্দসম্পদ্ ও ছন্দমাধুর্য্য ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও মোহিতলালের পাঠকসংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায় নাই কেন? রবীন্দ্রনাথের কথা বলিয়াছি। তা ছাড়া, আরও কতকগুলি কারণ ছিল বা আছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা মোহিতলাল প্রমুখ কবিদিগের কবিতাকে সাধারণের গোচরীভূত করার চেষ্টা বাংলা-সাহিত্যে দেখা যায় নাই। তাই, শুধু মোহিতলালের নহে, অনেকের কবিতাই আমরা পড়ি নাই। আমরা নোট-বইয়ের শাসনের দ্বারা শাসিত না হইয়া এক পা চলিতে ভুলিয়াছি,— কাব্যরস আস্বাদনেও চাই নোট বইয়ের সহায়তা। নতুবা কবিতার আস্বাদনও করিতে পারি না। অনেক সময়ে কবিতার অপব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে তাহার মর্য্যাদার আসন হইতে নামাইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত করি। মোহিতলালের কবিতার এইরূপ অপব্যাখ্যা হইয়াছে, বা হইতেছে। স্মরগরল কাব্যখানি বি, এ অনার্সের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল। ইহা পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়ার পর হইতেই শিক্ষা-বিভাগে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর কাব্যখানিকে পাঠ্যতালিকা হইতে অপসারিত করার চাঞ্চল্য খানিকটা কমিয়াছে। তাঁহার কবিতা নাকি দুর্ব্বোধ্য — রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এমনি অপবাদ এককালে শোনা যাইত। তাঁহার কাব্যে নাকি উদগ্র কামনার ছবি রহিয়াছে, তাঁহার কবিতা নাকি erotic।

মোহিতলালের কবিতা দুর্ব্বোধ্য কি না, তাহার বিচার পাঠকগণ এই সমালোচনা পাঠ করিয়া করিবেন। তবে তাঁহার কবিতা যে নিছক কামনার ছবি নহে — এ কথাটুকু কেবল এখানে বলিয়া রাখি।

আর একবার, — বাংলা-সাহিত্যে তখন 'কল্লোলে'র যুগ। সেই যুগে মোহিতলালের কবিতায় যে উদগ্র কামনার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে এমন কথা কবিকে শুনিতে হইয়াছিল। তখন সেই সকল সমালোচকদের ভুল ভাঙ্গিবার জন্য কবি তাঁহার 'স্মরগরল' কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রথম কবিতাটি রচনা করিয়া সমালোচকদিগের উত্তর দিয়া লিখিয়াছিলেন—

ওগো সুখহীন সুখ-লম্পট! সুরতের কৌতুক
তোমাদেরি বটে, সে লীলা রসসে নহি আমি উৎসুক।
মোর কামকলা — কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন বিলাস,
আমি যে বন্ধুর কোলে করে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ!

ঐ কবিতাটির মধ্যে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে — রতিরূপ বিষাধার হইতে বিষপান করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরে প্রেমসুধার প্রকৃত আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য উপলব্ধ হয়। ইহাই এই কবিতার — তথা, কাব্যগ্রন্থখানির মূল বক্তব্য। সুতরাং স্মরগরলের কবিকে সম্ভোগের কবি না বলিয়া, রূপতান্ত্রিক কবি বলাই সমীচীন। "স্মরগরল" কবিতায় কবি কামদেবকে নবতনু ধারণ করিয়া আসিতে দেখিয়াছেন —

অনঙ্গ পুনঃ অঙ্গ ধরিল — ঘর বেশে এল চোর!

অনঙ্গের এক কামগন্ধহীন শুচিশুভ্র নবমূর্ত্তি কবি ধ্যান করিয়াছেন, তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই 'স্মরগরল' রচনার কালে crude emotions-গুলি বিলীন হইয়া গিয়াছে।

সেই সে মূরতি ধেয়াইনু যবে স্বপন-সোপানে বসি,—
একে একে মোর মনের নিশীথে উজারা গেল খসি।

বাঁশীতে বাজিল ব্যথার সোহিনী,
রহিল হলা — চির-বিরহিণী,
কেলি-কদম্ব-মূলে বিরাজিল উদাসীন বারাণসী।

কবি এখানে সম্ভোগের কথা বলেন নাই — 'স্বরগরল' কাব্যের মধ্যেও নিছক সম্ভোগের কথা কোথাও ব্যক্ত হয় নাই। তাই কাব্যখানির মূল সুরটির ইঙ্গিত দিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন। —

স্বরগরলের জ্বালা হল তার বুকের নীলাম্বরী —
মোর কামবধূ বিধিমতে জাগে বিয়োগের
বিভাবরী।

তিনি সম্ভোগের বিপরীত বিয়োগের মাধুর্য্যের কথাই কবিতাটির মধ্যে বলিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সম্ভোগকে কবি তাঁহার জীবনে সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন নাই। যদি এই কবির কবিতায় শুধুমাত্র প্রখর কামনা থাকিত, তবে অতি-আধুনিক কবিদের মত তিনি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতেন। কিন্তু সে পথে কবির কল্পনা যায় নাই। তিনি দেহের দ্বারা সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের কথা 'স্বরগরল' কাব্যের কোন কোন কবিতার মধ্যে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু দেহাতীত সৌন্দর্য্যের ধ্যানও তিনি করিয়াছেন। কবি শুধু ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত নহেন, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যেরও তিনি উপাসক। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া, নিঃশেষে নিংড়াইয়া পান করিয়া — তারপর তিনি অতীন্দ্রিয়লোকে যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে কামনার মধুগন্ধ বা বাসনার লোলুপতা তখন লোপ পাইয়াছে।

বুদ্ধ কবিতায় কবি ভগবান্ বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়াছেন 'বাসনায় আছে বিষ?' উত্তরও কবি দিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন —

আছে সাথে বিষম ওষধি!
অমৃত বরষী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা! —
কামেরই সে ভিন্নরূপ — নাম তার জানে বটে সবে,
প্রাণের রহস্য তবু এক সেই! — জন্মাবধি
তাহারি বিহনে কারো মিটে না যে মরণের ক্ষুধা!

সেই প্রেম! জন্ম জন্ম তারি লাগি ফিরিছে সবাই!
এই দেহ-পাত্র ভরি, যেই দিন উঠিবে উছলি'
ঘুচিবে দুরন্ত দুঃখ, মৃত্যুত্রাস রবে না যে আর!
বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি রবে না সবাই,
মুক্তাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা তিথি উঠিবে উজলি' —
মার দিবে হাসিমুখে হাতে তুলি' বাঁশীখানি তার।

বাসনায় বিষ আছে বলিয়া ভগবান বুদ্ধ বাসনার মূল উৎপাটন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবি প্রেমের সাহায্যে বাসনাকে জয় করিতে চাহিয়াছেন। প্রেমকে তিনি দুঃখ-বিষের বিষম ওষধিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। প্রেমের দ্বারা ভোগপ্রবৃত্তিকে জয় করা, দমন করা 'স্বরগরল' কাব্যের মূল সুর। প্রেমকে স্বরগরলের কবি কামনামাত্র মনে করেন নাই। কামনাকে তিনি প্রেমের স্নিগ্ধ আলোকে — প্রেমের স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। কামনা বা রূপরস-সম্ভোগের মধ্য দিয়া প্রেমলোকে পৌঁছানই কবি-জীবনের সাধনা। মোহিতলালের মধ্যে নিছক কামনা কখনই প্রাধান্য লাভ করে নাই। তিনি শুধু মদিরাক্ষি বলসেনাকে নয়, বুদ্ধিতাক্ষি যশোধরাকেও ভালবাসিয়াছেন। তাই তিনি বলেন —

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
প্রিয়াহারা —
রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা!

তাঁহার কল্পনায় রতিই চিরবিরহিণী রাধায় পরিণত হইয়াছে। তিনি কবি কীটসের মত চান — To bear unhurt the shock of extreme thought and sensation without weariness."

বৃদ্ধ কবিতাটির মধ্য দিয়া মোহিতলালের বিশিষ্ট জীবনদর্শন যেমন ধরা যায় — তাঁহার 'স্বরগরল' কাব্যের অন্তর্গত আরও কয়েকটি কবিতায়ও কবির জীবনদর্শন স্পষ্টীভূত হইয়া আছে। 'রূপমোহ' কবিতাটি তাহাদের মধ্যে একটি। অপূর্ব্ব কবিতা এটি। 'স্বরগরল' কাব্যের মধ্যে যে কয়টি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, তাহার মধ্যে এটি একটি।

এই কবিতার মধ্যে কবি তাঁহার অন্তরের হ্লাদিনী শক্তির, তাঁহার মানসী-প্রতিমার, তাঁহার অন্তরলক্ষ্মীর এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। প্রেয়সীরূপে কল্পনার বিলাসভবনে একদিন ইনি কবিকে মাতাল করিয়া রাখিয়াছিলেন। অকস্মাৎ সেই সৌন্দর্য্যপ্রতিমার মধ্যে তিনি এক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন। এতকাল যাঁহাকে লইয়া কামনা-বাসনার লোকে অপরূপ ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া কবিচিত্ত মুগ্ধ হইয়া ছিল, ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ উপচার দিয়া কবি যাঁহার দেহারতি এতকাল করিয়াছিলেন — ইন্দ্রিয়জ সুখ হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া যে অন্তরলক্ষ্মীর সেবায় তিনি একদিন নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যাঁহার অঙ্গে নব নব অলঙ্কার দিয়াও কবিচিত্তের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না, সেই নর্ম্মসঙ্গিনীকে একদিন অকস্মাৎ স্নেহমায়াহীন মহাবৈরাগিণী মূর্ত্তিতে দেখিয়া কবির হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন — 'এ কি মূর্ত্তি উদাসিনী" — তাঁহার মনে হইতেছে —

একি সেই ? কণ্ঠে যার পরাইনু
সর্ব্বসুখ-বিনিময় পণে
কল্পনার পদ্মনরী বুক ধুক করে বুকে
পাঁচখানি মুকধুকি তার —
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি অঙ্গরাগ
মিলাইনু যার প্রসাধনে
প্রাণের সঙ্গীত রসে — এক পাত্রে ধরেছিনু
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ উপচার !
যার বেণীবন্ধ হতে মাথার দর্পণখানি
সন্তর্পণে খুলি' লয়ে হাতে
হেরিলাম মুখচ্ছবি রক্তহীন অন্ধকারে,
দুর্ব্বিষহ হর্ষে শিহরিয়া —
আমারি নয়নে যেন তার দুটি আঁখিতারা
ফুটে আছে অসীম তৃষাতে,
বুঝি না, দেহের মাঝে কেবা নিদ্রা যায়, কেবা
জাগে কার চেতন হরিয়া !
যার শুভ্র উৎসঙ্গে একদা পূর্ণিমা-নিশি
পরায়েছে চারু চন্দ্রহার
সবারে শিথিল নীবি, বসু হবে সংজ্ঞাহারা
আদরের মধুর লগনে, —
সেই মোর প্রাণেশ্বরী আজ মোরে চিনিল না !
সর্ব্ব স্মৃতি পরিচয়ভার
নিমেষে মোচন করি' চাহিল সে আনমনে
অন্তরীক্ষে, সুদূর গগনে !

কবির মানসপ্রতিমার এই বৈরাগিণী মূর্ত্তি কবিকে বিস্মিত করিয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখিত করে নাই। শুধু দুঃখের অনুভূতি বা করুণ অনুভূতিই কবিতাটির শেষ কথা নয়। ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্য উপভোগ হইতে মুক্ত হইয়া অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যবোধের আনন্দও এই কবিতার মধ্যে রহিয়াছে। যতদিন কবি তাঁহার মানসপ্রতিমার সৌন্দর্য্যসুষমা সম্ভোগ করিয়াছেন ততদিন তাঁহার প্রকৃত স্বরূপটি যেন তিনি দেখিতেই পান নাই। —

নেহারিনু অনিমিখ ? নারী কিংবা অপ্সরা সে ?
আঁখি তার রেখেছিল ঢাকি।

কিন্তু কামনা বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যখন সেই সৌন্দর্য্যপ্রতিমার পানে কবি চাহিয়াছেন, তখন তাঁহার রূপাতীত রূপময়ী রূপ কবিকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধির যে আনন্দ, তাহাতে অভিসিঞ্চিত করিয়াছে। কবির মতে ভোগকে পরিবর্জ্জন করিলে যেমন সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি হয় না, তেমনি

অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যোপলব্ধি না থাকিলে সৌন্দর্যপ্রতিমার পরিচয় অপূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রেয়সীরূপে যাহাকে তিনি একদিন পাইয়াছিলেন, তাহাকে দেবীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তবে কবির অন্তর শান্তি মানিয়াছে এবং আনন্দের অনুভূতিতে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন —

দেবী সে, প্রেয়সী নয় ! — এ যে তাই আরো
রূপ !
একি মোহ স্নেহ অবসানে ?

সম্ভোগের দ্বারা কবি সৌন্দর্যকে সঙ্কুচিত করিতে চাহেন না। তাই কবির দৃষ্টিতে নারীর প্রেম প্রথমে রতি হইয়াছিল, কিন্তু যখন তিনি মোহমুক্ত হইলেন, তখন সেই প্রেমের আরতিই তিনি করিয়াছেন। পূজার পাত্র লইয়া কবি নারীসৌন্দর্যের উপলব্ধির বাসনা শেষ পর্যন্ত এই কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রেম ও কাম এই দুইয়ের সমন্বয়ের একমাত্র উপায় হইতেছে ভোগক্ষুব্ধ যৌবনকে 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতির' মধ্যে নিমজ্জিত করা, — যাহাকে বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াছেন 'তটস্থ ভাব' তাহাই অবলম্বন করা। মোহিতলালও তাহাই করিয়াছেন। তিনি তটস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া, নির্লিপ্ত হইয়া সৌন্দর্যলক্ষ্মীর দেহাতীত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া কবিতাটি সমাপ্ত করিয়াছেন।

তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যে ধরণের আধ্যাত্মিকতা বা অতীন্দ্রিয় রূপতৃষ্ণা আছে, মোহিতলালে তাহা কোনদিনও প্রবল অথবা সর্বস্ব হইয়া উঠে নাই। তাঁহার কাছে দেহ সত্য, প্রাণ সত্য — দেহই অমৃত ঘট, আত্মা তার কেন অভিমান'। কবি বলেন ইহা যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহারাই "আত্মার নির্বাণতীর্থ নারীদেহে চায় তবু আত্মার সন্ধান।" ইঁহাদের কাছে নারী 'মিলনে মলিন', 'বিরহে শ্রেয়সী'। কিন্তু মোহিতলাল দেহাতীত আত্মাকে কখনও সর্বস্ব বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি দেহবাদী কবি — তাই "যাহা নাই, তাহার দ্বারা আনন্দলোক বিরচন না করিয়া, যাহা আছে তাহার মধ্য দিয়াই তিনি সৌন্দর্যের আস্বাদন করিয়াছেন।" (মোহিতলাল মজুমদার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পর্কে)।

ঠিক এইরূপ সৌন্দর্যসম্ভোগবাসনা বাংলা সাহিত্যের আর এক কবির মধ্যে ছিল। তিনি ভারতচন্দ্রের স্বভাব কবি গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাসের কাব্যপ্রেরণার মূলে একমাত্র তাঁহার নিজস্ব তীব্র অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এইরূপ অনুভূতির তীব্রতা বা বলিষ্ঠ কল্পনা মোহিতলালের কবিতাতেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

বায়রন বলিয়াছেন Passion-ই কবিতা। সকল কবির কাব্যবিচারে কাব্যের এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য না হইলেও, গোবিন্দদাস সম্বন্ধে কাব্যের এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য। তাঁহার কাব্যে আমরা পাই Passion-এর তীব্রতম প্রকাশ; তাই তাঁহার কবিতার মধ্যে রহিয়াছে একটা বলিষ্ঠতা, প্রাণশক্তির এক অপূর্ব উল্লাস। তাঁহার "কস্তুরী" কাব্যের মধ্যে "আমার ভালবাসা" শীর্ষক কবিতায় কবির যে অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে এই কবির কবিধর্মের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন —

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
অমৃত সকলি তার মিলন-বিরহ !
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা
দেহ ছাড়া প্রেম কথা,
কাদুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ !
আত্মায় আত্মায় যোগ,
বুঝি না সে উপভোগ
অদেহী আত্মারে আসে কিসে ছুঁয়ে লহ ?

তোমাদের রীতি-নীতি
বুঝি না পবিত্র-প্রীতি
তোমরা কি পৃথিবীর নরলোক নহ ?
আমি তাই ভালবাসি অস্থিমাংস সহ।

এইখানে যে দেহতান্ত্রিকতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি- তাহাই মোহিতলালের উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ তাঁহার "বিস্মরণীর" যুগ পর্যান্ত এই দেহতান্ত্রিকতাই কবির মধ্যে প্রবল হইয়াই ছিল, ইহা বলিতে পারি। 'স্বপন-পসারী'র কবি দেহবাদী — "অঘোরপন্থী"; 'বিস্মরণী'র কবি "স্পর্শ-রসিক," — তিনি বলেন — "দেহী আমি, মন্দিরে মন্দিরে তাই পরশ ভিখারী।" 'মোহমুদ্গর' কবিতাতে কবি এই দেহবাদিতাই প্রকাশ করিয়াছেন, — "কামনার ফুলে" মালা গাঁথিয়াছেন। —

সেহে তোর প্রাণ আছে ?
তবে কেন ওরে ভীরু নিত্য উপবাসী —
চিরমৃত্যু-মোক্ষ অভিলাষী ?

মোহিতলাল বলেন, — "রমণীর দেহ-মণিপদ্মে যেই মাণিক উথলে" সেই আলোক অথবা সেই আনন্দের সন্ধান যাহারা পায় না, তাহারাই আত্মার পিয়াসী — আত্মার সন্ধানে রত। কিন্তু কবি দেহভোগের মধ্যে আত্মার আনন্দ-জীবনানন্দ উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন, —

দেহ ভরি' কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদিরা,
ধূলা মাখি' খুঁড়ি লও কামনার কাঞ্চনি
হীরা।
— মোহমুদ্গর (বিস্মরণী)

গোবিন্দদাসের মত তিনিও সৌন্দর্য্যের উপাসক মহেন, প্রণয়ী, —

"আমার দেবতা সুন্দর সে যে"
পূজা নয়, ভালবাসি।"
— রতি ও আরতি (স্বরগরল)।

গোবিন্দদাসের কাছে সৌন্দর্য্য যেমন একটা ভাব নয়, মূর্ত্তি ; এবং সে মূর্ত্তি প্রণয়িনী নারীর, — মোহিতলালের কাছেও নারী তদ্রূপ। কামনানলে তিনি গোবিন্দদাসের মতই সুন্দরের হোম করিয়াছেন। তবে মোহিতলালের দেহতান্ত্রিকতা শুধুমাত্র দেহতেই পর্য্যবসিত নয়। কারণ, যাহা দেহমাত্রেই পর্য্যবসিত বা সম্পূর্ণ—তাহা লইয়া কোন উৎকৃষ্ট কবিতারই জন্ম হইতে পারে না। তিনি নারীদেহকে সুন্দর ও মহান্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া — শবসাধক তান্ত্রিকের মত দেহকে শব করিয়া শিবকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন, — অতীন্দ্রিয়লোকে যাত্রা করিয়াছেন। অঘোর-তান্ত্রিকের মত তিনি দেহভোগের ভিতর দিয়া চরমানন্দ আস্বাদন করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার কাছে দেহ দেহাতীতকে লাভ করার উপায় মাত্র।

'বিস্মরণী'র যুগ পর্য্যন্ত এই কবির মধ্যে দেহবাদিতা গোবিন্দদাসের মতই সর্ব্বস্ব হইয়া ছিল। কিন্তু 'স্বরগরলে'র যুগে কবির মধ্যে ভোগে অতৃপ্তি জাগিয়াছে, তখন তিনি বলিতেছেন —

"আমার পীরিতি দেহরীতি বটে,
তবু সে যে বিপরীত !"

স্বরগরল কাব্যে শুধু দেহজ প্রেমে কবির তৃপ্তি হইতেছে না, তাই "মদনের হাসিমুখে বেদনার উল্লেখ" তিনি লক্ষ্য করিয়া মদনের অপরূপ যোগিবেশ ধ্যান করিয়াছেন, "দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন সঙ্গীত" শুনিয়াছেন। কবির প্রৌঢ় বয়সের এই কাব্যে দেহাতীত সৌন্দর্য্যের জন্য যেখানে কবির আকুলতা জাগিতেছে সেখান হইতে সুরু রবীন্দ্রপ্রভাব। 'বিস্মরণী' রচনার কাল পর্য্যন্ত তিনি রবীন্দ্রপ্রভাবকে যথাসম্ভব এড়াইয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু 'স্বরগরলে' রবীন্দ্রপ্রভাব ও দেহবাদিতার সংমিশ্রণে স্বীয় কল্পনাকে একটি বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।

এখানে তিনি কবি Whitman-এর মতই যেন বলিতেছেন —

"I have said that the soul is not more
than the body
And I have said that the body is not
more than the soul."

গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন, মোহিতলালের উপর আর একজন কবির প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছে। তিনি কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনও মোহিতলালের মত সম্ভোগের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তিনিও মোহিতলালের মত "পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া অনাবিল প্রীতির মধ্যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিয়া গিয়াছেন।" মোহিতলালও বলিয়াছেন —

"আমি মদনের রচিনু দেউল দেহের বেদীর 'পরে
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ ফুল সাজাইনু থরে থরে।"

— স্মরগরল

পঞ্চেন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া মোহিতলাল ধরণীর রূপ রস বর্ণ গন্ধ আলোর আস্বাদন করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল উভয়েই সৌন্দর্যের উপাসক কবি। কিন্তু উভয়ের কবিকল্পনায় এবং সৌন্দর্য-সম্ভোগ-পদ্ধতির মধ্যে এক অতি সুস্পষ্ট পার্থক্যও আছে। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসাধনায় একটা প্রীতিবিভোরতা লক্ষিত হয়। তিনি হৃদয়ের মধ্যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার আরতি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, কবি তখন আপনাকে সৌন্দর্যের পাদপীঠতলে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন। তখন তাঁহার আত্মকর্তৃত্ব লোপ পাইয়াছে, ভাব এক প্রীতিতে তিনি তখন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তাঁহার সৌন্দর্যের সেই পূজাগৃহে তিনি কোন প্রকার চিন্তা বা বিচারকে পাদক্ষেপ করিতে দেন নাই। কিন্তু মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথের মত সৌন্দর্যের শুধুমাত্র আরতি করেন নাই। কারণ মোহিতলাল জানেন যে—যেখানে পূজা সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার মদনের মত নিরস্ত্র হইতে হয়, তাহার মত —

"জানু পাতি' বসি', নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার" —

পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের পদপ্রান্তে পূজা-উপচাররূপে সমর্পণ করিতে হয়। মোহিতলাল বলেন —

কবিচিত্তে রূপের পিপাসা
মিটে না প্রীতির রসে — রূপ আগে, পরে ভালবাসা!
— রতি ও আরতি।

প্রীতিবিহ্বলতার দ্বারা মোহিতলাল নিজেকে দেবেন্দ্রনাথের মত আচ্ছন্ন করিতে প্রস্তুত নহেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া তিনি সৌন্দর্যসম্ভোগ-প্রয়াসী। দেবেন্দ্রনাথে অতিরিক্ত মগ্নতা ছিল, তাই নারীর সৌন্দর্য-সন্দর্শনে তিনি আত্মহারা — নারী তাঁহার কাছে প্রহেলিকাময়ী। এই প্রহেলিকার অন্তরালে তিনি নারীর সত্যকার রূপের সন্ধান পান নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন —

"চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী।
সারা সন্ধ্যা সারা নিশি রূপ-বৃন্দাবনে বসি'
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।"

নারীর সৌন্দর্যকে তিনি এইভাবে অবলোকন করিয়াছেন, কিন্তু এই অবলোকনের মধ্যে কোনপ্রকার কামনা বা বাসনা ছিল না — ছিল ভাবমুগ্ধ হৃদয়ের নতি-স্বীকার। প্রীতিবিহ্বলতার জন্য রূপসাগরে ডুব দিয়াও তাঁহার অন্তরূপের উপলব্ধি বা আস্বাদন হয় নাই। ফলে সৌন্দর্যের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যোপাসক কবি, নারী তাঁহার সৌন্দর্যসাধনার সাকার বিগ্রহ। মোহিতলালেও আমরা তাহাই পাইয়াছি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মত প্রীতিবিহ্বলতা বা অতিরিক্ত মগ্নতার দ্বারা মোহিতলালের সৌন্দর্যোপলব্ধি ব্যাহত

হয় নাই। এ সম্বন্ধে কবি মোহিতলালের নিজেরই একটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য — "অতিরিক্ত মন্ময়তার ফলে কল্পনা ক্ষুণ্ণ হয়, কল্পনার মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় অবাস্তবতার আভাস থাকে। বাস্তবকে একেবারে তিরস্কার না করিয়া, মন্ময় কল্পনার দ্বারা তাহাকে আত্মসাৎ করিবার শক্তি যেখানে যত অধিক, সেখানেই একটা অখণ্ড রসসৃষ্টির পরিচয় তত সুলভ।" সমালোচক মোহিতলাল যাহা কাব্য-সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, কবি মোহিতলাল সম্বন্ধে তাহা বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। মোহিতলালে অতিরিক্ত মন্ময়তা নাই, অতীন্দ্রিয় অবাস্তবতার আভাস তাঁহার কাব্যে কোথাও সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে নাই। বাস্তবকে — দেহকে — এই ধরণীর মাধুর্য্যকে মোহিতলাল কোনদিনও অস্বীকার করেন নাই। ইঁহার নিকট রূপ যেমন সত্য, অরূপও তেমনি সত্য। রূপের মধ্য দিয়া তিনি অরূপকে সন্দর্শন করিয়া তবে তৃপ্তি মানিয়াছেন। এইখানে মোহিতলালের কল্পনার স্বকীয়তা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কাছে নারীসৌন্দর্য্য কবির হৃদয়ের আরতি লাভ করিয়াছে। নারীর হৃদয়রহস্যের উদ্ঘাটন বা 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব' দেবেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে কোথাও নাই, মোহিতলালে তাহা আছে। সৌন্দর্য্যকে realise করার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের লোভ নাই, সৌন্দর্য্যকে তিনি সর্ব্বত্রই idealise করিয়াছেন। মোহিতলাল সৌন্দর্য্যকে realise করিয়া — সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ আস্বাদন করিয়া, বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়া, পরে সৌন্দর্য্যকে idealise করিয়াছেন বা সৌন্দর্য্যের অতীন্দ্রিয় মাধুরীর আস্বাদন করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যপিপাসা Intellectual নয়, অতিমাত্রায় emotional। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত বিহারীলালের কবিমানসের সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই নিজ নিজ ভাবস্বপ্নে বিভোর ছিলেন, বাহিরের প্রতি উদাসীন ছিলেন।

তপোবনে ধ্যানে থাকি
এ বসন্ত-কোলাহলে!" — বিহারীলাল

দেবেন্দ্রনাথের কল্পনায় বিহারীলালের মত ঠিক ধ্যানশীলতা ছিল না বটে, কিন্তু নেশার মত্ততা ছিল। সৌন্দর্য্য-আস্বাদনে বিহারীলালের মত এইরূপ ধ্যান বা নেশার মত্ততা কিছুই আমরা মোহিতলালে পাই নাই।

দেবেন্দ্রনাথের কবিতা ইন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা। এখানে ইংরেজ কবি কীটসের সঙ্গে তাঁহার কবিকল্পনার সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ উভয়ের কাব্যেই একটা প্রবল sensuousness বা রূপতৃষ্ণার লক্ষণ আছে। উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব সৌন্দর্য্যের পূজারী — সৌন্দর্য্যকে উভয় কবিই পরম সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এই উভয় কবির মধ্যে প্রকৃতিগত একটা গভীর বৈষম্যও ছিল। এ সম্বন্ধে মোহিতলালই বলিয়াছেন : —

"কীটসের সৌন্দর্য্য-পিপাসা অতি প্রখর বস্তু-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির বস্তুসকলের রূপ, রং, রেখা, গতি ও স্থিতির ভঙ্গি — এ সকলই আশ্চর্য্য-রূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধির মধ্যে কেবল ভোগবিলাস বা ভাবস্বপ্ন ছিল না, অতি নিপুণ জ্ঞানক্রিয়াও ছিল। তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য্যের যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিত, তাহার মূলে সাক্ষাৎ উপলব্ধির অভিজ্ঞতা, অনুভূতির অভিজ্ঞতা থাকিত, কেবলমাত্র প্রাণের অন্ধ আবেগের দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন হইত না। তাঁহার কল্পনা ছিল সুস্থ, সবল ও প্রকৃতির।"

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথে ভোগবিভোরতা বা ভাবস্বপ্ন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে দেখা যায়, ভাবের অতলে আত্ম-বিস্মৃতির আনন্দই দেবেন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষত্ব। তাঁহার কল্পনায় প্রখর সচেতনতা নাই, অন্ধ ভাবাবেগে তিনি তাঁহার কল্পনাকে চালিত করিয়াছেন।

কীটস প্রকৃতির বা নারীর রূপমাধুর্যের মধ্যে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত সৌন্দর্য্যকে তিনি আহরণ করিয়া আনেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যপ্রতিমার ও প্রকৃতির রূপের নেশায় বিভোর হইয়া যান। তিনি তখন বলেন —

"এ ভাঙা দেহমাঝে (এ কি গো তামাসা)
ঢালিয়াছ এক রাশ প্রীতি-ভালবাসা।
কবিত্বের অহঙ্কার হয়েছে মা চুরমার
আমিত্ব ডুবিয়া গেছে প্রীতি-
পারাবারে !" —
'অমৃত আলাপী' —
দেবেন্দ্রনাথ সেন।

মোহিতলালে দেবেন্দ্রনাথের মত এইরূপ ভোগবিভোরতা আছে, কিন্তু তাহা বাস্তবকে বরণ করিয়া। তাঁহার ভাবাবেগবিহ্বল কামনার মধ্যেও বাস্তবের ক্ষুধা বর্ত্তমান। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে sensuousness ছিল বটে, কিন্তু প্রীতিবিভোরতার জন্য, অতিরিক্ত মনস্বতার জন্য তাঁহার sensuousness প্রগাঢ়, সুগভীর ও প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু মোহিতলালের sensuousness কীটসের অনুরূপ। কীটসের মতই বিশ্বসৌন্দর্য্যের রূপ রং রেখা আশ্চর্য্যরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার শক্তি মোহিতলালে প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বরূপতঃ কবি মাটির কবি — তিনি আকাশের নহেন। কল্পনাসর্ব্বস্বতা কখনও তাঁহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে নাই।

এইবার রবীন্দ্রনাথের সহিত স্বরূপতঃ কবির কল্পনার সাদৃশ্য ও বৈষম্য লক্ষ্য করিলে এই কবির কল্পনার স্বরূপ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইবে।

আমরা দেখিয়াছি — মোহিতলাল দেহবাদী কবি, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে বা নারী-সৌন্দর্য্য বর্ণনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকাব্যে এই দেহবাদের বিরোধিতা খুব স্পষ্ট হইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়াতীত যে সৌন্দর্য্য তাহাতে বিশ্বাসী। দেহগত প্রেমের মধ্যে যে কামনার কলুষতা আছে, সৌন্দর্য্য-সন্ধানী কবি তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। প্রেম রবীন্দ্রনাথের কাছে ভোগ্য বস্তু নয়, পূজার ফুল — "যারে বলি ভালবাসা তারই নাম পূজা।" রাত্রির নর্ম্মসহচরীকে প্রভাতের দেবীরূপে দেখিয়া কবি তবে তৃপ্ত হইয়াছেন। এই-জন্য সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর পদতলে তিনি নিক্ষিপ্ত করিয়া-ছেন ভোগের দেবতা মদনকে। অপরূপ রূপকে রবীন্দ্রনাথ শুধু লালসার সামগ্রী হিসাবে দেখেন নাই। তাই তিনি বলেন —

অজস্র চাকুক মুখ বসনের কোণে
ভঙ্গুর বিকাশ হেরি লাজে নত শির।
আসুক বিমল ঊষা মানব-ভবনে
লাজহীন পবিত্রতা — শুভ্র বিবসনে।
— কড়ি ও কোমল

রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে আদর্শবাদী কবি — তাঁহার মন অতিরিক্ত রকম আধ্যাত্মিক — অতীন্দ্রিয় রূপের পূজারী তিনি। তাই প্রেমকে এবং রূপকে idealise করিয়াই তিনি তৃপ্ত। কবির প্রেমের যে প্রকাশ তাহা একেবারে নৈর্ব্যক্তিক (imper-sonal)। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় কবি-মানুষটির হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যে passion-এর তীব্রতা কোনদিনও প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম আত্মসমাহিত — শান্ত। তাঁহার প্রেমে প্রখর পিপাসা নাই, আছে সন্ধ্যার মত শান্ত স্নিগ্ধ ভাব।

এমন কি 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে কবি যেখানে ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্য্যের উপাসক, সেখানেও নর-নারীর প্রেম অতীন্দ্রিয় ভাবে বিমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। 'চুম্বন' কবির কাছে 'ভালবাসার অধর সঙ্গমে তীর্থযাত্রা' রমণীর 'স্তন' কবির নিকট 'পবিত্র সুমেরু', 'দেবতা

বিহার-ভূমি'। এই কাব্যে কবির মধ্যে ভোগস্পৃহা জাগিয়াছে, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত সংযত। কবির ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত একটা অতৃপ্তিও লুকাইয়া আছে। ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা, সঙ্কীর্ণতা, ব্যর্থতার ঊর্দ্ধে সৌন্দর্য্যের যে চিরন্তন পরমমনোহর রূপ আছে, তাহা "কড়ি ও কোমলে" দেহ-সৌন্দর্য্যমূলক কবিতা-গুলির মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে, দেহের মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান কবি পাইয়াছেন —

শত বসন্তের যেন কুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়।
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্য্যালোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণ-ছায়ায়।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের যুগ হইতেই পার্থিব সুখ সৌন্দর্য্যভোগে কবির ক্লান্তি জাগিয়াছে, তাই তিনি মিলনপূর্ণিমার অবসান কামনা করিয়া বলিয়াছেন —

দাও খুলে দাও সখি তই বাহু পাশ।
চুম্বন মদিরা আর করায়োনা পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ!

দৈহিক ভোগক্ষুধার মোহ ক্ষণস্থায়ী; সীমাবদ্ধ প্রেমে অতৃপ্তির বেদনা। তাই কবি বলেন —

এ মোহ কদিন থাকে, এ মায়া মিলায়।
কিছুতে পারে না আর বাধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম কবির অন্তরের পবিত্র ধন — সে পবিত্র সম্পদ দেহের কামনাপঙ্কে লুটাইতে পারে না —

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে দাঁড়াও সরিয়া
ম্লান করিও না আর মিলন-পরশে।
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া
বাসনা নিঃশ্বাস তব সরল বরষে।

কবির কাছে কেবল দেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, অথবা শুধু ক্ষণিকের ভোগতৃপ্তির জন্য এ মানব জীবন সৃষ্ট হয় নাই। প্রেম ক্ষণিকের মোহ নহে —

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি,
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

দেহ যে স্বর্গের অপার্থিব আলোকে চির-ভাস্বর এ বোধ 'কড়িও কোমলে'ই জাগিতে সুরু করিয়াছে, তারপর রবীন্দ্রনাথে ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

কবির যে আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় সাধনার সুরু 'কড়ি ও কোমলে' — তাহা সুস্পষ্ট এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াছে কবির 'মানসী' কাব্যে।

কড়ি ও কোমলে বাস্তবের মোহ কবিকে অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ভোগলিপ্সু মনের অন্তরালে যে মহত্তর আত্মা আছে — 'মানসী'তে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি সেখানে বলিয়াছেন, — ভোগের দ্বারা আত্মার পরিতৃপ্তি হয় না — "বৃথা এ ক্রন্দন! বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা!" অথবা — "কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণার!" সৌন্দর্য্যের যে মানসীমূর্ত্তি কবি এখানে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া একটি বাস্তবাতীত অপরূপ মূর্ত্তি। কবিকল্পনার দ্বারা বাস্তবকে রূপান্তরিত করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাই মানসী। 'বাসনা-মলিন আঁখি কলঙ্ক' তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেশ ও কালের পরিবর্ত্তন তাহাকে বিকৃত করিতে পারে না।

মানসীতে কবির সৌন্দর্য্যবোধ স্থূল কামনা ও ইন্দ্রিয়জ ভোগের রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমেই অন্য লোকে অগ্রসর হইতেছে, নর্ম্মসখী ক্রমে মানসী হইয়া উঠিতেছে। কামনার সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষণিকতা হইতে সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে মুক্ত করিবার জন্য একটা বেদনাময় ব্যাকুলতাই মানসীর মূল সুর।

মানসীতে কবি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেহসীমার মধ্যে না পাইয়া আত্মার রহস্যশিখার আলোকে তাঁহাকে চিনিতে চাহিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও প্রেম কবির কাছে অনন্ত ও অসীম। কবি বলেন, দেহের মধ্যে প্রেমের বা সৌন্দর্য্যের অনন্ত সত্তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। —

সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে-সম্পদে,
জীবনে-মরণে,
শত শত আবর্ত্তনে
সতত উঠিতেছে ফুটি,
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

— অনন্ত প্রেম, মানসী।

কিন্তু মোহিতলাল দেহসৌন্দর্য্যের মধ্যেই — অনন্ত অসীম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছেন — কবির "রূপমোহ" কবিতাটিতে সেই কথাই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের দেহহীন জ্যোতিটুকুকে অন্তরমধ্যে অনির্বাণ রাখিতে চাহিয়াছেন, মোহিতলাল দেহের মধ্যেই দেহাতীত জ্যোতিটুকু দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যোপলব্ধিকে পূর্ণতা দান করিতে চাহিয়াছেন।

এইরূপে রবীন্দ্রনাথে আমরা ক্রমাগত পাইয়াছি অতীন্দ্রিয় ভাবের মূর্ত্তি। নারীর অপরূপ রূপ 'কড়ি ও কোমলের' যুগে কবির চিত্তে তরঙ্গ তুলিয়াছিল সত্য; কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিয়া তিনি নরনারীর প্রেমকে অতিন্দ্রীয় ভাবেই বিমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার নারীর রূপ বিদেহী — উর্ব্বশী কবিতায় সে "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী", কাহারও আয়ত্তাধীন বা উপভোগ্য নহে। সে বিশ্বসৌন্দর্য্যের প্রতীক, সে অকস্মাৎ পুরুষের চিত্তকে আত্মহারা করিয়া দিয়া ধমনীর শোণিতে চাঞ্চল্যের শিহরণ জাগাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। দিকে দিকে তাহার নাগিয়া "কাঁদিছে ক্রন্দসী" — কারণ, সে সৌন্দর্য্য absolute — abstract, তাহা সকল সম্পর্কাতীত, মানুষের বাসনাকে চরিতার্থ করার ক্ষমতা তাহার নাই।

এইখানেই মোহিতলালের কবিকল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার বৈষম্য। মোহিতলাল ভাবপ্রবণ কবি হইলেও, কোন মানসী-প্রতিমার প্রতিকারত তিনি নহেন, জীবন্ত সৌন্দর্য্যপ্রতিমার আরাধনায় তিনি মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার আত্মার আনন্দ দেহতৃষ্ণার মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে করেন আত্মা ছাড়িয়া দেহ নহে, দেহ ছাড়িয়াও আত্মার আনন্দানুভূতি অসম্ভব। —

তাই তো তোমার দেহের সীমায় ধরতে পারি
আলিঙ্গনে,
দুয়ের ক্ষুধা, একের সুধা কেবল ত সেই পরম ক্ষণে।

এই হিসাবে মোহিতলাল পৌত্তলিক কবি। এই পৌত্তলিকতা তাঁহাকে বাস্তব জীবন ও বাস্তব জগতের অতি নিকটে আনিয়া দিয়াছে।

মোহিতলাল রোমান্টিক কবি। কিন্তু তাঁহার romance বাস্তব-সম্পর্করহিত নহে। তাঁহার প্রথম কাব্য 'স্বপন পসারী'তে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল কবিদৃষ্টিকে প্রসূত করিয়াছে সত্য এবং কল্পনার উচ্চৈঃশ্রবার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া মাঝে মাঝে তিনি অনন্ত কল্পলোকে ঘুরিয়া আসিবার প্রলোভন

ত্যাগ করিতেও পারেন নাই। কল্পনাপ্রবণতাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পারেন নাই, এ পর্যায়ে কোন প্রকৃত কবি তাহা পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার কল্পনাপ্রবণতা নিছক ছায়াশরীরী নহে। উহা বাস্তব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু স্বপ্নের মধ্যে তিনি বাস করেন নাই। তিনি তান্ত্রিক — তত্ত্বে দেহই সত্য, তথ্যে মহানির্বাণের ইঙ্গিত অথবা বৈরাগ্যের উদার গাম্ভীর্য্য কোথাও স্বীকৃত হয় না। মোহিতলাল কীটসের মত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপের পূজারী। তাঁহার মধ্যে একদিকে কীটসের মত অনুভূতিপ্রবণতা, অপরদিকে দেবেন্দ্র নাথের মত তীব্র দেহভোগতৃষ্ণা। জীবনকে তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন —

জীবন মধুর মরণ নিঠুর তাহারে দলিব পায়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।

ধরণীর রূপরস তাঁহার নিকট উপেক্ষার জিনিস নয়। মরণরূপে আসিলেও তাহা বরণীয় —

যে মরণ তারা মরিতে জানে না
তাহারে গরল বলে!
জানে না গরল নীল হয়ে আছে
মৃত্যুজিতের গলে।

যাহার শক্তি নাই, সে ভোগ বুঝিতে পারে না। যাহার আত্মবিশ্বাস নাই, সে পাপের নামে কুঞ্চিত হয় —

ত্যাগ নহে ভোগ — ভোগ তার লাগি
যে জন বলীয়ান্ —
নিঃশেষে ভরি লইবারে পারে
এত বড় যার প্রাণ।
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর তলে
নাই যার প্রাণ ধন,—
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের, রূপের মধ্যে অরূপের, বিচ্ছিন্নের মধ্যে সমগ্রের অন্বেষণ করেন। তিনি বলেন —

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি'।"

কিন্তু অরূপের কবি মোহিতলাল নহেন। 'স্বরগরলে'র কবির চক্ষে নারী দেবী নয়, — নারী-স্তোত্রে যে নারীর জয়গানে তিনি মুখর, সে নারী মানসী নয়, কল্পনাসর্ব্বস্ব অশরীরী নয়, সে নারী রক্ত-মাংসের মানবী। যে নারী রবীন্দ্র কাব্যে "অর্দ্ধেক মানবী আর অর্দ্ধেক কল্পনা" — মোহিত লালের কাব্যে তাহা পরিপূর্ণ রক্তমাংসের মানবী।

যে সৌন্দর্য্য-প্রতিমার বন্দনা মোহিতলালের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথের মত একটা এ্যাবস্ট্রাক্ট বা এ্যাবসল্যুট — দেহহীন ভাব-কল্পনা মাত্র নহে, দেহকেই আশ্রয় করিয়া ইহার পরিপূর্ণ রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দেহাতীত সৌন্দর্য্যবোধ মোহিতলালের কাছে একটা কল্পনা মাত্র। তিনি বলেন, তাহার সহিত মাটির মানুষের কোন্ সম্পর্ক আছে? নারীসৌন্দর্য্য যেখানে কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত সেখানে নারী কেবল স্বপ্নময়ী — রবির কাছে কমলিনীর মতই তাহা অসত্য — ভ্রমরের কাছে কমলিনীর মত তাহা সত্য নহে। —

বল দেখি, কমলের বধূ অলি, না সে ঐ
আকাশের রবি?
রূপ যে স্বপন তার — কামনার ধন
নয় বাসনার ছবি!
রূপসীর করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালবাসে কবি।
রূপ নহে সেই রস, রতি নয় — সে শুধু আরতি।
মনের নিশীথে সে যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি।
সে তো নহে ভোগ প্রয়োজন,
সে নয় প্রাণের ক্ষুধা — প্রেম নয়, সে তো
দেহ-পদ্মে মধু-আস্বাদন।
— রতি ও আরতি (স্বরগরল)

দূর হইতে রূপের আরতি মাত্র করিয়া কবি তৃপ্ত নহেন। এখানে মোহিতলালের সঙ্গে বেদান্তদর্শন বা সাংখ্য দর্শনের পার্থক্য।

বেদান্ত যাহাকে অবাস্তব বলিয়াছে, মোহিতলাল তাহাকেই রিয়াল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কবি বলেন, নারী এই সৃষ্টির হ্লাদিনী শক্তি — এই জিনিসটি যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রকৃতি হইতে নির্লিপ্ত হইয়া মানুষকে মুক্ত হইবার নির্দেশ দান করিয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের বিরোধী মত মোহিতলাল প্রকাশ করিয়াছেন। যে অনুভূতির সঙ্গে কবি নারীকে দেখিয়াছেন তাহাতে বাস্তবজীবনের প্রতি কবির সুগভীর অনুরাগ রহিয়াছে। তিনি তান্ত্রিক — তাই তিনি দেহকে, সৃষ্টিকে, জীবনকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন নাই। বৈষ্ণব সাধকদিগের মত তিনি রূপকে Idealise করেন নাই। তান্ত্রিকের মত জীবনকে তিনি মহনীয় করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি জীবন-রসিক কবি — অতীন্দ্রিয়তা-বর্জিত জীবন-রস-রসিকতা তাঁহার কবিতায় উৎকীর্ণ হইয়া আছে।

[আগামীবারে সমাপ্য]

মানুষের ভোগপিপাসার অসীমতা ও দুর্দমনীয়তা, এবং তাহাতেই তাহার যে শক্তি প্রকাশ পায় — তাহাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়, অন্য পরিচয়ও আছে। ঐ কামনা-বাসনাই মনুষ্যত্বের নিদান বটে, কিন্তু উহারও একটা উল্টা-মুখ আছে, তাহাও সেই শক্তিরই আর এক দিক্। বাঙালীর জীবনে এই দিকটির বিকাশ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সাহিত্যে তাহার প্রকাশ তেমন করিয়া হয় নাই। ……বাঙালীর রসজীবন ততখানি আধ্যাত্মিক বা অরূপতান্ত্রিক নয়; তাহা আত্মসমাহিত হইলেও রূপান্বেষী, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব না হইলেও দেহতান্ত্রিক। এক কথায় বাঙালী দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ দেহ ও আত্মার অভেদ সাধনার পক্ষপাতী। ইহার ফলে সে ঐ কামনা-বাসনাগুলাকে দেহের ক্ষেত্রেই আত্মার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে, দেহেরই ভবানীতে দেহাতীতের ক্রন্দনকে এক অপূর্ব গীতিঝঙ্কারে অমৃতনিঃস্যন্দী করিয়া তুলিয়াছে।

— মোহিতলাল

বঙ্গ-দর্শন

"যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর নির্ভর করিবে, ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম, তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে, তাঁহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করুন না করুন, দেশীয় সুলেখকমাত্রেরই উপর অধিকতর নির্ভর করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে সুশিক্ষিতমণ্ডলীর সাধারণ উক্তিপত্ররূপে পরিণত করেন, তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ইউরোপীয় সাময়িক পত্র এবং এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে যিনিই সম্পাদক, তিনিই প্রধান লেখক — ইউরোপীয় সম্পাদক মাত্র — কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহের তিনি ঘটক মাত্র, স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হন না। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।"

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই কারণেই বঙ্গদর্শন প্রকাশে অতিশয় বিলম্ব ঘটিয়াছে। বঙ্গদর্শন যাহাতে অতঃপর নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ড শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ হইল।

বঙ্গদর্শন এক্ষণে কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরিচালিত হইবে, সে সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণের মনে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক। বঙ্গদর্শনের জন্মদাতা এবং আদি সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্যের হস্তে উহার সম্পাদনা-ভার অর্পণ করেন, তখন তিনি তাঁহার অভিপ্রায়ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমের সেই উক্তি-ই আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম; ইহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে — পাঠক-পাঠিকগণ বঙ্গদর্শন-পরিচালনার ভবিষ্যৎ নীতি এবং আদর্শ জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিবেন।

মূল্যবিচার

অতি নিকটে রাখিয়া দেখিলে সর্ষপও পর্বত-প্রমাণ আকার ধারণ করিতে পারে, আবার অতি দূরে রাখিয়া দেখিলে পর্বতও সর্ষপ-সমান বলিয়া মনে হইবে। একই বস্তু নৈকট্য ও দূরত্বের দরুণ একেবারে বিপরীত বস্তু হইয়া পড়ে। ইহা স্থানের কারসাজী বা যাদু। ঠিক এই রকম একটী স্বভাব কালের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। আজ যাহা বৃহৎ বলিয়া মনে হয়, তাহাই আবার আগামী কাল একেবারে তুচ্ছ ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ইহা স্থান ও কালের স্বভাব, ইহাদের হাতের রঙ্ লাগিয়া একই বস্তু বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে একেবারে ভিন্ন মূর্তি লইয়া বসে। এই অবস্থায় কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব। অথচ, বস্তু বা ব্যক্তির নিজস্ব একটী মূল্য নিশ্চয় আছে, যাহাতে কালের ও স্থানের স্থূল হস্তাবলেপ লাগেনা, লাগিলেও বস্তুর বা ব্যক্তির প্রকৃত মূল্যটুকু ম্লান বা উজ্জ্বল কোনটাই করিতে পারে না। কিন্তু স্থানে ও কালে স্থাপন না করিয়া তো কোন কিছুই দেখা যায় না? কাজেই স্থান ও কালের এই ধর্ম মানিয়া লইয়াই মূল্য বিচার করিতে হয়।

* * *

মূল্য নির্দ্ধারণের কথাটা উঠিয়া পড়িল বিশেষ একটা কারণে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে গত এক শত বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ঘটনা বৃটিশ-শাসনের অবসান এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে পাকিস্তানের আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের পিছনে যে শক্তি ক্রিয়াশীল, তাহা বাস্তব মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল কায়েদে আজম জিন্নার মধ্যে। কায়দে আজম জিন্নাকে পাকিস্তানের একক স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়া থাকে, এক দিক দিয়া কথাটা সত্য। এই কায়েদে আজমের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণের কথাটাই মনে আসিয়াছে। মনে আনিয়া দিয়াছেন জিন্নার ভগ্নী, মিস ফতেমা জিন্না। তিনি তাঁহার লোকান্তরিত ভ্রাতার সম্বন্ধে একটী উক্তি করিয়াছেন, যার ফলে মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে, জিন্নার প্রকৃত স্বরূপটী কি? মূল্যবিচারেই বা তাঁহার কোন্ স্থায়ী সার্থকতা মানব সমাজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত দেখা যায়?

* * *

সমসাময়িক কালের দৃষ্টিতে জিন্নার দুইটী রূপ দেখা যায়,—একটী রূপ মুসলমানদের চোখে-দেখা, অপরটী হিন্দুর বা জাতীয়তাবাদীর চোখে দেখা। মুসলমানদের চোখে জিন্নার যে মূর্তি ধরা দিয়াছে, তাহা এক শক্তিমান পুরুষের মূর্তি। সেখানে মুসলমান সমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদিত। অপর মূর্তিটীও শক্তিমানেরই রূপ কিন্তু সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় নাই। মূলে একই ছবি — জিন্না শক্তিমান, জিন্না স্বসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু ভালোবাসা তিনি কোন ক্ষেত্র হইতেই পান নাই। জিন্নার শক্তিকে শ্রদ্ধা বা ভয় করা চলে, কিন্তু জিন্নাকে ভালোবাসা চলে না। জিন্না মুসলমান বা হিন্দু কাহারও নিকট আপন জন নহে, শক্তির চূড়ায় তিনি সকলের নিকট হইতে একক ও দূর।

* * *

জিন্নাকে মানুষের কোন সম্বন্ধেই বাঁধা চলে না, ইহাই জিন্নার রূপ — সমসাময়িক কালের দৃষ্টিতে। কিন্তু কোন শক্তিই নৈর্ব্যক্তিক থাকিতে পারে না, যদি তাহা সমাজে ক্রিয়াশীল হইতে চাহে। কাজেই জিন্নার ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু সে ব্যক্তিত্বে মানুষ ব্যক্ত হয় নাই, শুধু শক্তিমানই ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসায় যে-শক্তি শোধিত হয় নাই, সে-শক্তি নিজের সীমা পায় না। ফলে সে-শক্তি কল্যাণবাহী হইতে পারে না; যতবড় বিপর্য্যয় ও বিপ্লবই সে-শক্তিতে সংঘটিত হউক না কেন, তাহা ব্যর্থ। পাহাড়ের মাথায় বন্যা-বাঁধা,

কিন্তু নদীর দুই তটের সীমা মানিয়া লইয়া তবে তাহা প্রাণবাহী ও কল্যাণবাহী ধারা হইয়া দেখা দিতে পারে এই মাটীতে। সীমা লঙ্ঘন করিলেই নদী হইয়া বসে সব-ভোবানো সব-ভাসানো বন্যা, অর্থাৎ শক্তির তাহা ধ্বংস ও সংহার রূপ। সৃষ্টির মধ্যে স্থিতি ও প্রকাশের যে-সাধনা ও তপস্যা রহিয়াছে, ইহা তাহারই বিরুদ্ধ-শক্তি। ইহা মৃত্যুরই অন্য নাম ও অন্য রূপ।

• • • •

এখন মিস ফতেমা জিন্নার উক্তিটী উদ্ধৃত করার সময় হইয়াছে। কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্তানে সংঘর্ষ চলিয়াছে প্রায় আঠারো মাস। কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে সম্প্রতি নূতন উদ্যমে নূতন প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে। সর্ব্বত্র সভা-সমিতি হইতেছে, ছোটবড় সব নেতাই মুখ খুলিয়া বক্তৃতা পেশ করিতেছেন। করাচীর এক জনসভায় মিস ফতেমা জিন্নাও অবশেষে বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি শেষে তাঁহার লোকান্তরিত ভ্রাতার নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সজ্ঞানে কায়েদে আজম যে-শেষ কথাটী বলিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা এই — "Kashmir must be ceded to Pakisthan", অর্থাৎ, "কাশ্মীরকে পাকিস্তানের পাওয়া চাই-ই।"

• • • •

মূল্য নির্দ্ধারণ ও মূল্য বিচারের সুবিধা হইবে অনুরূপ আর একটী ব্যক্তিকে যদি গ্রহণ করি — গান্ধীর কথাই বলিতেছি। জিন্নার মৃত্যু রোগশয্যায়, গান্ধীর মৃত্যু সুস্থ শরীরে। জিন্না শায়িতাবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন দীর্ঘদিন, কর্ত্তব্যে চলমান অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে জিন্না নির্জ্জন কক্ষে কতিপয়-বেষ্টিত, গান্ধী জনতার মধ্যে জনতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত। জিন্নার মৃত্যু লোকচক্ষুর অন্তরালে, গান্ধীর মৃত্যু সহস্রচক্ষুর সম্মুখে। জিন্নার মৃত্যু স্বাভাবিক ও সাধারণ, গান্ধীর মৃত্যু অস্বাভাবিক ও অসাধারণ, জিন্নার জীবনদীপ ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত তৈলাভাবে, গান্ধীর জীবনদীপ আকস্মিক ঝাপটায় নির্ব্বাপিত পূর্ণপ্রজ্বলিতাবস্থায়। জিন্নার শেষ উক্তি— "কাশ্মীর চাই", গান্ধীর শেষ উক্তি — "হে রাম।" জিন্না দীর্ঘদিন রোগশয্যায় থাকিয়া মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিয়াছেন, আর ততই লোভকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন — "কাশ্মীরকে ছাড়িব না।" অর্থাৎ জিন্না মৃত্যুর মধ্যেও মুক্তি দেখেন নাই। আর গান্ধীর সম্মুখে মৃত্যুর আগমন অকস্মাৎ, কিন্তু সেই অকস্মাৎ আগন্তুকের হাতে মন্ত্রের সবটুকু সমর্পণ করিয়া তিনি তাহার হাতেই নিজেকে দিলেন, যিনি তাঁহার "রাম", অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির বিধাতা। গান্ধী মুক্ত, তাই মৃত্যুতেও তাহা ব্যক্ত। জিন্নার শেষ উক্তি, "কাশ্মীর চাই", — ইহার ব্যাখ্যার আর এখন আবশ্যক করে না। জিন্নার মূল্য নির্দ্ধারণ আর নাই বা করিলাম। তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। জিন্না ও গান্ধী দুই মৃত্যুর দৃষ্টিতে একটী কবিতারই কি দুইটি অর্থ পরিস্ফুট হইতে পারে, তাহা ভাবিবার জন্য বিদ্যাপতির রচিত কয়েকটী পংক্তি পাঠকদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া গেল —

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥

ভারতবর্ষ ও কমনওয়েলথ

ভারতীয় গণপরিষদে ১৬ই ও ১৭ই মে দুদিনের বিতর্কের পর কমনওয়েলথ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর নীতি ও কর্ম্মপন্থা অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে — ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্ররূপে অবস্থান করিবে। ভারতবর্ষ

কমনওয়েলথে থাকিবে, কথাটা ঠিক নহে; কথাটা হইবে ভারতকে কমনওয়েলথের সদস্যরূপে গ্রহণে কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্র সম্মত হইয়াছেন। সম্মতির প্রশ্ন কেন উঠে? উঠে এই কারণে যে, ভারতবর্ষ নিজেকে "সার্বভৌম স্বাধীন রিপাবলিক" রূপে ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। তাই, 'রিপাবলিক' কমনওয়েলথের সদস্য থাকিতে পারে কিনা, প্রশ্নটা স্বভাবতঃই উঠিয়া পড়িয়াছে। প্রশ্নের যে উত্তর মিলিয়াছে, তাহা পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে।

* * *

লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের শেষে ২৭শে এপ্রিল যে-বিবৃতিটী প্রচারিত হইয়াছে, তাহার উপর একবার চোখ বুলানো আবশ্যক। প্রথমেই নজরে পড়ে যে, কমনওয়েলথ হইতে দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত 'বৃটিশ' শব্দটী পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে ইংরেজ ঐতিহ্য ও গর্বে আঘাত লাগিবার কথা। কিন্তু ইংরেজ জাতির 'সেন্টিমেন্টাল' বলিয়া বদনাম নাই। এই আঘাত সহ্য তাঁহারা করিয়া লইয়াছেন। বাস্তব অবস্থাকে বা অনিবার্যকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য জাতীয় চরিত্রে যে বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা আবশ্যক, ইংরেজ জাতির তাহা আছে, তাহা আর একবার প্রমাণিত হইয়াছে।

* * *

বিবৃতির সারমর্ম উদ্ধৃত হইতেছে: নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষ "সার্বভৌম রিপাবলিক" হইবে, ইহা অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রকে ভারত গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন। ভারতবর্ষ আরও জানাইয়াছেন যে, কমনওয়েলথের সদস্য থাকার ইচ্ছাও তাঁহাদের আছে। ভারতবর্ষ রাজাকে (King) কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছায় স্বীকৃত ও গঠিত সমবায়ের 'প্রতীক' (Symbol) রূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। রাজা এই সমবায়ের 'প্রধান' (head of the Commonwealth) থাকিবেন। সমস্ত বিবেচনা করিয়া সদস্য রাষ্ট্র সমূহের গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের কমনওয়েলথে অবস্থান পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন।

* * *

বিবৃতির কয়েকটা বিষয় পরিষ্কার করার দরকার রহিয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাজার (Crown) কোন স্থান নাই। রাজানুগত্য প্রভৃতি ব্যাপার ভারতবর্ষের সম্পর্কে একেবারে পরিত্যক্ত ও বর্জিত হইবে। এক কথায়, শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত উভয় দিক দিয়া ভারতবর্ষ "স্বাধীন রিপাবলিক" রাষ্ট্র। রাজা শুধু কমনওয়েলথের বন্ধন-সূত্রের প্রতীক, ইহার অধিক কিছু তাঁহার ক্ষমতা বা কর্তব্য নাই। অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্র ডোমিনিয়ন, সুতরাং তাঁহাদের ক্ষেত্রে রাজানুগত্য বলবৎ থাকিবে। সুবিধা ও সুযোগের পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং বিশ্বশান্তি, প্রগতি, ইত্যাদি লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করাই এই কমনওয়েলথের আদর্শ বা উদ্দেশ্য। ইহা জাতিপুঞ্জেরও (U.N) আদর্শ। ইহাই বিবৃতির বক্তব্য।

* * *

ভারতীয় গণপরিষদ ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (এ, আই, সি, সি) উভয় প্রতিষ্ঠানই বিপুলভাবে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন। দেশের জনমতের অধিকাংশেরই সমর্থন ইহার পিছনে আছে, এইরূপ অর্থ করা কাজেই একেবারে অযৌক্তিক হইবেনা। কিন্তু বিরোধীপক্ষ বলিয়া জনমতের আর একটা অংশ বর্তমান আছে। সে মহল হইতে এই সিদ্ধান্তকে বলা হইয়াছে "বৃহৎ বিশ্বাসঘাতকতা" (Great Betrayal) ও "প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা।" কেন ইহা 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা কিন্তু ব্যক্ত হয় নাই। কেন ইহাকে "প্রতিক্রিয়াশীল" পন্থা আখ্যা

দেওয়া হইল, সে সম্বন্ধেও যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। তাবে মনে হয়, বিরোধীপক্ষ ইহাকে "সার্ব্বভৌম স্বাধীন রিপাবলিক"-এর আত্মমর্য্যাদার হানিকর মনে করিয়াছেন। অর্থাৎ যুক্তিটী নিছক "সেন্টিমেন্ট"। 'সেন্টিমেন্ট' হইলেও তাহা তুচ্ছ করিবার নহে।

* * *

গণপরিষদের বিতর্ক হইতে বিরোধীপক্ষের যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তাহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার পাইবেন যে, বিরোধীপক্ষ কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোন যুক্তি উত্থাপন করিতে পারেন নাই। বিরুদ্ধ পক্ষের আশঙ্কা ও অভিযোগ উত্থিত হইয়াছে। কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষ এশিয়ার অপরাপর রাষ্ট্র হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। কেন, তাহা কিন্তু বলা হয় নাই। বরং বিপরীত ব্যাপারই সংঘটিত হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনেকে আশা করিয়া থাকেন। "সার্ব্বভৌম রিপাবলিক" কেমন করিয়া কমনওয়েলথের সদস্য থাকে এই হইল দ্বিতীয় অভিযোগ। উত্তরে বলা হয় যে, সে-চিন্তা ভারতবর্ষের নহে, অপর ডোমিনিয়নদের। ভারতবর্ষের স্বাধীন নীতি ও কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের কোন বাধাই আইনতঃ ও কার্য্যতঃ নাই, স্বাধীন বৃটেনও তো এই গোষ্ঠীর অন্যতম, সুতরাং অভিযোগ অর্থহীন। তৃতীয় অভিযোগ, ভারতবর্ষ ইঙ্গ-মার্কিণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে এতদ্বারা পূর্ব্বেই পক্ষ নির্ব্বাচন সম্পন্ন করা হইয়াছে। উত্তরে বলা হয় যে, ইহাতে নিজেদের সম্বন্ধে বিশ্বাসহীনতাই সূচিত হয়। যুদ্ধে যোগ দেওয়া বা না দেওয়া, কিংবা পক্ষ নির্ব্বাচন করা তখনকার অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্বার্থই প্রধান বিবেচ্য হইবে এবং তদ্দ্বারাই তখন কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত হইবে।

* * *

কমনওয়েলথের স্বপক্ষে যাহা বলা হইয়া থাকে অতঃপর তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। এতদ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধনের সুবিধা হইবে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার স্থান স্বীকৃত হইবে এবং মর্য্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। কালের নিয়মে কমনওয়েলথের ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের কমনওয়েলথের মূলতঃ এখন কোন সম্বন্ধ নাই। বিশ্ব সভ্যতায় ভারতবর্ষের যাহা দেয়, ইহার মাধ্যমে ও সমর্থনে, তাহার পথ সুগম হইবে। ইহার পরে এশিয়ার ইতিহাসে ভারতবর্ষের জাতীয়তা দ্বারাই বিশেষ ভাবে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। জাতি-বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ, কলোনী, সাম্রাজ্য প্রভৃতির অতঃপর এশিয়ার বুক হইতে উচ্ছেদ সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য আরও একটী সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। একক ও বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রীয় সত্তা বর্ত্তমান পৃথিবীতে অসম্ভব, ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক দিয়া এবং পৃথিবীর শান্তির দিক দিয়াও ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। সর্ব্বশেষে, অর্থনৈতিক, সামরিক বহু বিষয়ে ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের ইহাই প্রশস্ততম পন্থা। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

* * *

ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে যাঁহার দান ও অভিজ্ঞতা অবিসম্বাদীরূপে সন্দেহাতীত ও শ্রদ্ধেয়, তিনি হইলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এই সম্পর্কে তাঁহার "আজাদ হিন্দ গবর্ণমেন্ট"-এর অনুসৃত নীতিতে যে মনোভাব ও কর্ম্মপন্থার আভাস পাওয়া যায়, তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। নেতাজীর দৃষ্টি ও মনোভাব যথাসাধ্য অনুধাবন, সম্ভব হইলে নিশ্চিন্ত মনে অনুসরণ করাও যাইতে পারে। অবশ্য অবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য ও উপযোগী ব্যবস্থা গৃহীতব্য।

* * *

আন্তর্জাতিক নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণে কোনরূপ আবেগ ও সেন্টিমেন্টকে নেতাজী আদৌ প্রশ্রয় দেন নাই, এই মূল কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বাস্তবাবস্থার সবচেয়ে উপযোগী পন্থা নির্বাচনই রাষ্ট্রনায়কের একমাত্র চিন্তার ও কর্তব্যের বিষয়। আর একটী বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ব্যবস্থা তৎকালীন অবস্থার উপরেই একান্ত নির্ভরশীল, ইহাই নেতাজী মনে করিতেন। আন্তর্জাতিক সন্ধি-চুক্তি চিরস্থায়ী ব্যাপার নহে, ইহা মনে রাখা দরকার। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহাদেরও আবশ্যিক পরিবর্তন অনিবার্য।

* * *

"অক্ষ-শক্তি" সরকার" অক্ষশক্তিবর্গ (Axis Nations) কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। অর্থাৎ ইহারা "অক্ষ-শক্তি সরকার"-এর মিত্রপক্ষ। নেতাজী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন শুধু ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। জার্মেনী ও জাপানের মিত্রপক্ষ হইয়াও তাহাদের শত্রুপক্ষ সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিন্তু নেতাজী যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। অক্ষপক্ষের মিত্রশক্তি হইয়াও নেতাজী যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সন্ধির শতরকম বন্ধন সত্ত্বেও শত্রু ও মিত্রনির্বাচনে কোন বাধা-বাধকতা নেতাজীর ছিলনা। জার্মেনী ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত বিরোধ ও মনোমালিন্য সত্ত্বেও রুশ-জার্মান সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে উভয় রাষ্ট্রের কোন পক্ষেরই কিন্তু আপত্তি হয় নাই। অর্থাৎ, দরকার হইলে শত্রুর সঙ্গেও সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া রাষ্ট্রনীতিতে অনুমোদিত। ইঙ্গ-মার্কিণ ও সোভিয়েট এই দুইপক্ষের মধ্যে মিলন ও যোগাযোগ স্বপ্নের অতীত ছিল, কিন্তু যুদ্ধকালে এই ত্রয়ীই একত্রিত ও সংঘবদ্ধ মিত্রপক্ষরূপে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে, আবার প্রয়োজন শেষে উভয়পক্ষ পূর্বের মত ব্যবধানে সরিয়া আসিয়াছে। জাপান ও সোভিয়েট পরস্পর বন্ধু-রাষ্ট্র না হইয়াও যুদ্ধের প্রায় সমগ্র অধ্যায়টীতেই কূটনৈতিক সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছিল, অথচ রাশিয়া তখন জাপানের বন্ধু জার্মেনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত এবং জাপান তখন রাশিয়ার বন্ধু ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। নেতাজীর অনুসৃত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিও এই মূলসূত্র ধরিয়াই পরিচালিত হইয়াছে।

* * *

কমনওয়েলথ সম্বন্ধে আমরা এত কথা লিখিতেছি দেখিয়া বঙ্গদর্শনের পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয় বিস্মিত হইতেছেন, কারণ বঙ্গদর্শন মুখ্যতঃ সাহিত্য-পত্রিকা — আন্তর্জাতিক-রাজনীতিরূপ মহদ্ধর্মের অনুশীলন আমরা এড়াইয়া চলিতেই চাই। তথাপি, আমরা যে মাঝে মাঝে বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি তাহার কারণ — ভারতহিতৈষী যে কয়েকজন মহাপুরুষ এখনও দলগত রাজনীতির বাহিরে আছেন, বর্তমানের কোলাহলে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইতেছি না। নির্ভয়ে যাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে পারিতাম, তাঁহারা চুপ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের প্রাণগত উৎকণ্ঠা অকপটে প্রকাশ না করিয়া পারি না — আমরা ইহাও জানি যে, সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নহেন এমন বহু ব্যক্তি অনুরূপ উৎকণ্ঠাই বোধ করিতেছেন।

বস্তুতঃ আপনারা বৃথা চিন্তিত হইতেছেন। বৃটেন এবং অন্যান্য ডোমিনিয়নগণ নিজেদের প্রয়োজনেই ভারতকে কমনওয়েলথে রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছে। বৃটিশ জাতির আত্মরক্ষার প্রয়োজন যখন গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন সে কিরূপ বাস্তবধর্মী হইয়া উঠে ; বিশ্বপ্রেম, ধর্মবোধ সম্পর্কিত

বৃত্তিগুলি কিরূপ অনায়াসে বিসর্জন দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বৃটিশের স্বজাতিপ্রীতি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই — আমাদের সংশয় শুধুই সংশয় নয়, আশ্বাসের কারণও তাহাই। এশিয়া সম্বন্ধে বৃটিশ নেতৃবর্গের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' সম্বন্ধে ভারতের নেতৃবর্গের অনেকেই যেরূপ আস্থাবান, আমাদের বিশ্বাস সেরূপ দৃঢ়মূল হইয়া উঠে নাই বলিয়াই ভয় আর কিছুতে ঘোচে না। কমনওয়েলথে অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলি পরস্পরের সাহায্য ত' পাইবে। ইহাতে কি আমরা আশ্বস্ত হইব? এই 'পরস্পরের সাহায্য'রূপ ছিদ্রপথে ভারতের কি যাইবে এবং ভারতই বা কি পাইবে তাহা নেতৃবর্গ জানেন। সেই কারণেই কমনওয়েলথ সম্পর্কে আলোচনাতেও রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। একদা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হইবে। এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার, আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়।" আজ পলিটিক্স্ আমাদের পক্ষেও গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরাও রাজনৈতিক নেতাদের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছি। কমনওয়েলথে অন্তর্ভুক্তির পরে পণ্ডিতজীর বিশ্বপ্রেম ভারতের পক্ষে ভবিষ্যতে কতখানি মঙ্গলজনক হইবে তাহা ভাবিয়াই আমরা শঙ্কিত না হইয়া পারি না। গান্ধীজীর মৃদু হাসির পশ্চাতে যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত তাহা আজ নির্বাপিত, নেতাজীর বিশাল বক্ষের আশ্বাসও নাই। তথাপি কমনওয়েলথ সম্বন্ধে হয়ত আমরা বৃথাই এত চিন্তিত হইতেছি। যে গুরুতর প্রয়োজনে কমনওয়েলথ হইতে 'বৃটিশ' শব্দ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভারতকে কমনওয়েলথে রাখিতে বৃটিশজাতি স্বীকৃত হইয়াছে সেই প্রয়োজনেই ভারতকে কমনওয়েলথের বাহিরে নিক্ষেপ করিতেও তাহারা দ্বিধা করিবেন। অবশ্য সে ভাষা বিশ্বশান্তি এবং যে-কোন একটি পীড়িত জাতিকে রক্ষা করার অনুহাতেই করিবে। সুতরাং বৃটিশের সহিত ভারতের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্পর্ক আমাদের সমস্যা নয় — পর সামলানোই আমাদের একমাত্র সমস্যা। আমরা বিশ্বাস করি যে, শক্তির হইলেও আত্মবিশ্বাসী, পরপ্রত্যাশাহীন ভারতই ইউরোপের প্রকৃত সহযোগিতা লাভ করিতে পারে — বিশ্বশান্তিও সেই রক্ষা করিতে পারে। ভারতের স্বধর্ম রক্ষা করিয়া তাহাকে সুস্থ সবল সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এমন নেতা আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাই। নিরাশার এই ঘনান্ধকারে আমরা ধৈর্য ধরিয়া আছি, ভারতের সেই ভবিষ্যৎ ভাগ্য-বিধাতার পদধ্বনি শুনিবার জন্য কান পাতিয়া আছি — "তোমার অসীম শূন্য আছি, হে বীর পূর্ণ কর!"

কংগ্রেস — শরৎবসু — বাংলা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাংলা দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচন। সমগ্র শহরটার মানসিক বায়ুমণ্ডল উত্তেজনা ও উন্মাদনায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বোমা, এসিড-বাল্ব, অগ্নিসংযোগ, গুলীবর্ষণ যাবতীয় কিছুই এই ইলেকসনের ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কলিকাতা নগরীর সুস্থ স্বাভাবিকতা লোপ পাইয়াছিল, সমস্ত শহরটা যেন উন্মাদনার মদ্য আকণ্ঠ পান করিয়া লইয়া ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। দেশের ও জাতির প্রতিনিধি নির্বাচনের ইহা নিশ্চয় উপযুক্ত মানসিকতা নহে।

* *

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম শরৎচন্দ্র বসু অবতীর্ণ হন, কংগ্রেস পক্ষের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। হয়তো কংগ্রেসের ইচ্ছা ছিল না শরৎ বাবুর বিরোধিতা

করার। কিন্তু যুদ্ধ মাঠে নেমে দিতে শরৎ বাবুও প্রস্তুত ছিলেন না। চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ বিনোবিত হইল। কংগ্রেসকে শরৎচন্দ্র অবশেষে ঘর হইতে যুদ্ধের মাঠে নামাইতে সক্ষম হইলেন। তারপর আরম্ভ হইল যুদ্ধ। যুদ্ধটা প্রাদেশিক সীমা উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বভারতীয় গুরুত্ব গ্রহণ করিল। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেস সভাপতি ও সেক্রেটারীপ্রমুখ নেতৃবর্গ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেন, ভোটের জন্য আবেদন করিলেন। শরৎচন্দ্র তখন বিদেশে স্বাস্থ্য-নিবাসে।

* * *

বিপুল ভোটাধিক্যে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের আক্রমণের সম্মুখে কংগ্রেস বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। পরাজয়ের পূর্ব্বেই কংগ্রেস পরাজিত হইয়াছিল: যুদ্ধের মাঠের খবর যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন। যে-কংগ্রেস দীর্ঘ সংগ্রামে, আত্মত্যাগে সেবায় ভারতবর্ষের একত্ব ও অখিণ্ডতার প্রতিষ্ঠান, যে-কংগ্রেস স্বাধীন ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের ধারক ও বাহক, সেই কংগ্রেসই পরাজিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

* * *

কিন্তু সেই কংগ্রেস পরাজিত হয় নাই। যে-কংগ্রেস পরাজিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানের কংগ্রেস। চোরাকারবার, দুর্নীতি, আত্মীয়-পোষণ, ঘুষ, মুনাফা ইত্যাদির শতছিদ্রপথে যে-কংগ্রেসে ঘুণ ধরিয়াছে, সেই কংগ্রেসই পরাজিত হইয়াছে। অতীতের কংগ্রেসকে বর্ত্তমানের কংগ্রেসের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিলেন কংগ্রেসের কুকীর্ত্তি, দুষ্কর্ম্ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে। শরৎচন্দ্রের জয়ে এই অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে।

* * *

শরৎচন্দ্রের জয়ের কারণ কি? কেহ বলেন, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভা ও জনপ্রিয়তাই জয়ের কারণ। কেহ বলেন, তিনি নেতাজীর ভাই, তাই এই জয়। অর্থাৎ, শরৎচন্দ্র বলিতে যাহা বুঝাইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিটুকুই এই জয়ের কারণ। আবার কেহ বলেন যে, কংগ্রেস ইদানীং জন-অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাই এই পরাজয়। দুটা কথাই ঠিক। আবার কেহ বলেন যে, শরৎচন্দ্রের সপক্ষে কম্যুনিষ্ট হইতে সোস্যালিষ্ট পর্য্যন্ত দেশের যাবতীয় বামপন্থীগণ, হিন্দুমহাসভা, ফরোয়ার্ড ব্লক — এক কথায় কংগ্রেস ব্যতীত সকল শক্তিই যোগ দিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের পক্ষে অর্গানাইজেশন ভালো ছিল, ভলান্টিয়ার বেশী ছিল, বলিতে গেলে সমগ্র যুব ও ছাত্র সমাজই তাঁহার নির্ব্বাচনে প্রচারকার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাই এই জয়। ইহাও ঠিক। অর্থাৎ, ইহাকে একক শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জয় বলা ভুল হইবে। কেহ বলেন, অপর পক্ষে কংগ্রেসের নির্ব্বাচন ও প্রচার-কার্য্য দুর্ব্বল ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাই এই পরাজয়। ইহাও ঠিক কথা। অর্থাৎ জনগণের বিরুদ্ধ মনোভাবই শুধু নহে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগত দৌর্ব্বল্য ও অব্যবস্থাও এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ। কারণ যাহাই হউক, শরৎচন্দ্রের জয়ী না হইয়া গত্যন্তর ছিল না, ইচ্ছা করিলেও তিনি পরাজিত হইবার সুযোগ পাইতেন না, ইহাই প্রমাদিত হইয়াছে — বেষিক দিয়াই এই যুদ্ধকে দেখা ও বিচার করা হউক না কেন।

* * *

শরৎচন্দ্রের এই বিজয়ের ফল ও প্রতিক্রিয়া কি হইবে? ইহা যদি বড় হইয়া থাকে, তবে কংগ্রেস লাভবান হইবে। ঝড়ে বৃহৎ বৃক্ষের মূল ও শিকড় দৃঢ়তর হয় এবং নূতন প্রাণশক্তি তাহাতে ক্রিয়াশীল হয়। কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। এই পরাজয়ে কংগ্রেস ভূমিসাৎ হয় নাই, ইহা অতীব

সত্তা। কংগ্রেসকে ভাঙিয়া দিয়া তাহাকে নবতর রূপ দিবার শক্তি হয়তো গান্ধীজীর ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়া তাহাকে ধূলিশায়ী করিবার শক্তি গান্ধীজীরও ছিলনা। সুতরাং শরৎচন্দ্রের তো নাই-ই।

* * *

আর যদি ইহা ধূলি ও ধূম্রজাল সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে সময়ে সে-ধূমধূলি বিলীন হইবে, নিস্তরঙ্গ শান্ত আকাশ প্রসন্ন হাসিতে দেখা দিবে। এই ধূমধূলির আবরণের আড়ালে অশুভ শক্তির কয়েকটী গুপ্ত ওহার মুখ হয়তো খুলিয়া যাইবে। সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। বিধাতার যদি তেমনি অভিপ্রায় থাকে তবে এই রক্তপথে নির্গত শক্তির উপপ্লবে ভারতের রঙ্গমঞ্চে চীন, বর্মা প্রভৃতির শোচনীয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে। সেই বিরাট কুরুক্ষেত্রে মহানায়কের ভূমিকা গ্রহণের অধিকার, শক্তি ও সাধনা কোনটাই শরৎচন্দ্রের নাই। তিনি শুধু সেই কুরুক্ষেত্রের উপর নিজের অজ্ঞাতসারে যবনিকা উত্তোলন করিবেন, ইহার অধিক এই বিষয়ে তাঁহাকে আর কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইতিহাস কুরুক্ষেত্রের অভিমুখে গতি লইয়াছে, এ-আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। অন্ততঃ শরৎচন্দ্র এত বৃহৎ বিভীষিকা সৃষ্টির সূচনা করিতে পারেন নাই।

* * *

এই বার। কংগ্রেসের পরাজয় বাংলার নূতন নহে। সত্য কথা বলিতে কি গান্ধী-কংগ্রেসকে বাংলা কোনদিন গ্রহণ করে নাই, কংগ্রেস বাংলাতে এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেও সত্যিকার শিকড় প্রবেশ করাইতে পারে নাই। দেশবন্ধুর সময়ে পারে নাই, সেনগুপ্তের সময়েও পারে নাই এবং সুভাষচন্দ্রের আমলেও পারে নাই — যদিও এই তিন জন শুধু বাংলারই নহে, ভারতীয় কংগ্রেসের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন। দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় ও নেতাজী এই তিন নায়কই বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থনে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত। সংক্ষেপে, বাংলার যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টিরাই এই নেতৃত্রয়ের পশ্চাতে থাকিয়া বাংলার কংগ্রেসে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করিয়াছে। আর এই দুইটী দল কোনদিন গান্ধী-কংগ্রেস বলিতে অহিংসা, সত্য, খাদি ইত্যাদি যাহা বুঝাইয়া থাকে, তাহার কোন কিছুই গ্রহণ করে নাই। কংগ্রেস শুধু ব্যবহৃত হইয়াছে 'প্রাটফর্ম্ম' রূপে, শক্তি অর্জ্জনের ক্ষেত্ররূপে এবং ক্ষমতালাভের মূলকেন্দ্ররূপে। বাংলার কংগ্রেসের ইতিহাস কংগ্রেসের ইতিহাস নহে, কংগ্রেসের মুখোস পরিয়া বাংলার স্বকীয় ও নিজস্ব রাজনৈতিক সত্তাই আপনার অভিব্যক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। এই জন্য স্বাধীন বাংলাতে যখন গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব খাদি-গোষ্টির উপর অর্পিত হইতে দেখা গেল, তখন যে বাংলার ইতিহাসের সব চেয়ে প্রকাণ্ডতম বিস্ময়কর ঘটনাটী সংঘটিত হইল, ইহা কাহারও দৃষ্টিতে ধরা পড়িলনা। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, নোয়াখালী, বিহার, দিল্লী, পাঞ্জাব, সীমান্ত ও দেশবিভাগ ইত্যাদিতে দেশের দৃষ্টি ও মন আবদ্ধ হইয়া ছিল। তাই ইতিহাসের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা উপেক্ষিত হইয়াই রহিল।

* * *

আজও শরৎচন্দ্রের পিছনে যে-মূলশক্তি সক্রিয়, তাহাও মূলে বাংলার পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবী শক্তি, শুধু অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাদের বাহ্যিক রূপের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মাত্র। সুতরাং, ইহাকে কংগ্রেসের জয় বা পরাজয় কোনটাই বলা চলে না। শরৎচন্দ্রের পিছনে যেমন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেশ দাসের পিছনেও তেমনি পূর্ব্বোক্ত সেই বিপ্লবীশক্তিই সঞ্চিত ছিল। দেশবন্ধুর আমলে যাহা ঘটিয়াছে, আজিকার উপনির্ব্বাচনেও তাহাই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে

মাত্র। একটু দৃষ্টি প্রসার করিলে তাঁহাদের অতীতকেই আজিকার বর্তমানের মধ্যে আবিষ্কার করা সম্ভব হইবে। ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্ট নামক একটী শক্তি মাথা তুলিয়াছে, এই সুযোগে নিজেদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরৎচন্দ্রের পশ্চাতে তাহারা সমবেত ও সজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে দৃষ্টি যাঁহার আচ্ছন্ন হইবে, বাংলার স্বরূপ ও বাংলার কংগ্রেস সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান তাঁহার অনায়ত্তই থাকিয়া যাইবে।

* * * *

শরৎচন্দ্র কি বাংলাকে চিনেন? অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মধ্যে কি বাংলার সত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবে? এই প্রশ্নের সহজ ও স্পষ্ট উত্তর — না। বিচার ও বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। কয়েকটী সিদ্ধান্তই শুধু উল্লেখ করা যাইতেছে। শরৎচন্দ্রের সমগ্র রাজনৈতিক চরিত্র ও জীবনী অনুধাবন করিয়াই নিম্নোক্ত মন্তব্যে উপনীত হইতেছি। শরৎচন্দ্র শুধু আসর জাগাইয়া রাখিতে পারিবেন, কিন্তু বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম হইবেন না। বাংলার নেতৃত্ব মানে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের বাংলার নেতৃত্ব। সেই নেতৃত্বের উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক আধার লইয়া শরৎচন্দ্র প্রেরিত হন নাই। দেশবন্ধুর 'মৃত্যুহীন প্রাণ'-শক্তি শরৎচন্দ্রের নাই, নাই দেশবন্ধুর বিরাট প্রেমশক্তি। সুভাষচন্দ্রের দুর্দমনীয় কার্যতেজ শরৎচন্দ্রের নাই, নাই নেতাজীর সেই কর্মযোগ-সাধনা। সর্বোপরি, শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের দ্বার আজও উদ্ঘাটিত হইয়া আধ্যাত্মিক আলো-প্রেম-শক্তির অমৃত আদর্শ লাভ করে নাই। বাংলার নেতৃত্বের অধিকার লইয়া শরৎচন্দ্র আসেন নাই, ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

* * * *

আগামী দিনের বাংলা যাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ ও সার্থকতা লাভ করিবে, দেশ তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছে, আজিকার ঘূর্ণ-ধূলি-ঝড়ের মধ্যে তাঁহার আসন্ন পদধ্বনি শান্ত হইয়া কান পাতিলে শোনা যাইবে। সেই অনাগত মহানায়কের কিছু আভাস-পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনায় ও সম্পদে তিনি গান্ধীর চেয়ে সমৃদ্ধতর, তিনি মাতৃগর্ভ হইতেই মুক্ত-পুরুষরূপে জাত। ভারতের তপোবনের ঋষির দৃষ্টি ও জ্ঞান তাঁহার সহজাত। তাঁহার মধ্যে পুরাতন ভারতবর্ষের আত্মার পূর্ণরূপে সংহত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-দেশবন্ধু-নেতাজী এই ধারাপথে যে-বাংলা অভিব্যক্ত, বাংলার সেই অনাগত মহানায়কের মধ্যে একাধারে তাহার সংহত ও ঘনীভূত প্রকাশ আমরা দেখিতে পাইব। তিনিই নব ভারতের স্রষ্টা, তিনিই নব সভ্যতার ধারক ও বাহক। কলিযুগের কালো আকাশকে তিনিই সত্যযুগের বিদ্যুৎ-চক্ষুকে কিছুকালের জন্য উদ্ভাসিত করিয়া যাইবেন। তাই আজিকার এই উন্মত্ত উদ্দীপনা ও উত্তেজনার প্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করি —

"পরম কলুষ ঘুচায় তবু শুনি
স্থির দিবসের শান্ত শিবের বাণী।"

সম্পাদক : শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ

২৪ নং চৌরঙ্গী রোড, "ওমেগা প্রেসে" পিপলস্ পাবলিশার্স সিণ্ডিকেটের পক্ষে
শ্রীকালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত